মেঘলা আকাশ

রামপদ মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

১

দু'দশ ক্রোশ দূরের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শহর বলিলেও—আসলে হরিপুর একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে—তাহার পরিচয় কয়েকটি খোয়া-ওঠা পাকা রাস্তা আর চল্লিশ হাত অন্তর কতকগুলি কেরোসিন আলোর কাষ্ঠস্তম্ভে পাওয়া যায়। রাস্তায় গৈরিক ধূলার পরিমাণ যেমন প্রচুর—ছোটবড় গর্ত্তও তেমনি অসংখ্য। দিনের বেলাতেই সাবধানে পথ চলিতে হয়—রাত্রিতে তো কথাই নাই। ধূম-মলিন কাচের আবরণ ভেদ করিয়া স্বল্প-তেজ টিম্‌টিমে আলোর রেখা কতটুকু পথই বা প্রকাশ করিতে পারে—খানা-খন্দ চিনিয়া লওয়া তো দূরের কথা! সে আলোর আয়ুও দীর্ঘ নয়। রাত্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইতে-না-হইতে সেই শিখাটুকু অন্ধকারের কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। তখন পৌর-ব্যবস্থাকে অভিশাপ দিতে দিতে পথ অতিক্রম করে পুরবাসী।

এ গ্রামে প্রত্যহ বাজার বসে—দোকান-পসারের সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়। ছোট মাঝারি কতকগুলি ডাক্তারখানার

সঙ্গে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের নাম করা যায়। এ ছাড়া গোটা কয়েক শিব ও কালীমন্দির আছে, আছে হরিসভা, থিয়েটারের ক্লাব, পোষ্টাফিস আর বড় ইস্কুল। গ্রামের প্রান্তে আছে—ছোটমত একটা গঞ্জ ; নদীর অপর পার হইতে কিছু ধান—কিছু আলু আর আখের গুড় আমদানী হয়—এ পার হইতে চালান যায়—মিলের কাপড়, কালো কলাই আর খেজুর গুড়। ইহারই দৌলতে অনেকগুলি পরিবারের ভরণপোষণ হয় ; গ্রামে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও মন্দ নয়।

কিন্তু এ গাঁয়ের সব চেয়ে গৌরবের জিনিস হইল ওই ইস্কুল। এমন ভাল ইস্কুল অনেক জিলা-শহরেও দেখা যায় না। প্রকাণ্ড ইমারৎ—পূব-পশ্চিম লম্বা, সামনে ফাঁকা জমি—পিছনে খেলার মাঠ। মাঠের শেষে বাঁশ ও লতাগুল্মের ঝোপ—বিজন বনের খানিকটা আভাস উহারই মধ্যে পাওয়া যায়। শহর যেন একটা হাত পাড়াগাঁয়ের কাঁধে রাখিয়া—অন্য হাতে নিজের ঐশ্বর্য্যকে মেলিয়া ধরিয়াছে। অনেকগুলি মাষ্টার আছেন ইস্কুলে —ছাত্রসংখ্যাও বহু। গ্রাম্য জমিদারের বদান্যতার চিহ্ন ইস্কুলটির সর্ব্বাঙ্গে। তাঁহাদের বংশের সন্তানরা পুরুষানুক্রমে ইস্কুলের সম্পাদকের পদে বৃত আছেন—মাথার উপরে আছেন জেলার শাসনকর্ত্তা—সভাপতি রূপে। সরকারী সাহায্যের খাতিরে সরকারের ক্ষমতাকে অর্চ্চনা করার বিধি বহুকাল হইতেই বলবৎ।

মাষ্টার ছাড়াও ইস্কুলের একজন চাকর আছে। তাহার কাজ হইতেছে ছেলেদের পানের জন্য বড় জালায় জল ভরিয়া রাখা—দোয়াতে কালি দেওয়া,—মাষ্টারদের টেবিল চেয়ার সাফ করা—ছুটির সার্কুলার ক্লাসে ক্লাসে পৌঁছাইয়া দেওয়া আর ক্লাস বসার সময়,—টিফিনে ও ছুটির ঘোষণায় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজানো। যাহাদের ঘড়ি নাই—এই ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তাহারা বেলার হিসাব রাখে।

এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন হরিশ। অত্যন্ত নিয়মানুগ ও নীতিবিৎ শিক্ষক হরিশ।

ঘণ্টা পড়ার সঙ্গেই তিনি ক্লাসে গিয়া বসেন। নিম্নতম শ্রেণীর ছেলেদের শিক্ষকতা করার দায়িত্ব অনেকে স্বীকার করেন না—তবু হরিশ মাষ্টার জানেন শিক্ষার দুরূহতম অধ্যায় এইখান হইতেই আরম্ভ। একতাল কাদার ডেলা—দক্ষ কারিগরের কাছে হয়তো কিছুই নয়—কিন্তু মূর্ত্তি গঠনের আদিতম শিল্প-বাসনা ওরই মধ্যে নিহিত। কাদা হইতে নানা জাতীয় পুতুল তৈয়ারী সে ইচ্ছামত করিতে পারে। ভাঙ্গা—গড়া—বিকৃত বা সুন্দর করা সবই তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেই জন্যই তাতে প্রচুর আনন্দ।

কোন কিছু সৃষ্টির আনন্দই মানুষের প্রকৃত আনন্দ। দিনের পর দিন ধরিয়া এই যে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ—ষত্ব ণত্ব বিধান

—ধাতুরূপ—সমাস, অঙ্ক প্রভৃতির সমস্যা ছেলেদের সমাধান করিয়া দিতে হয় ইহাতে সৃষ্টির আনন্দ জন্মিবে কিসে? ইস্কুলে চাকরি গ্রহণ করার সঙ্গে হরিশ মাষ্টার যে চেয়ারে বসিয়া প্রতিদিন শিক্ষকতা করেন—যে বেঞ্চে বসিয়া সকলরবে ছেলেরা পাঠ গ্রহণ করে—যে ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ির সাহায্যে অঙ্ক কষিয়া দেখানো হয়—কোনটিই তো পঁচিশ বছরের মধ্যে সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনের দাগ স্বদেহে গ্রহণ করে নাই। ক্লাসঘরের আয়তনও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকগুলি কড়ি বরগা উইয়ে খাইয়াছে—জানালার কপাট স্বস্থানচ্যুত হইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে—ঘণ্টা-বাজানো ভাগবত চাকরটা বার দুই বদল হইয়াছে। আগে আপিস ঘরে ঘড়ি ছিল না—জরাজীর্ণ আলমারি ছিল একটি। এখন বেশ বড় একটি ঘড়ি আসিয়াছে আর সেক্রেটারির অনুগ্রহে গোটা দুই আলমারি বাড়িয়াছে। আর আসিয়াছে প্রকাণ্ড একটা টানা পাখা। কিন্তু পাখা টানিবার লোকের অভাববশতঃ চেয়ারে বসিয়া যিনি যতটুকু পারেন দড়িটা একবার নাড়িয়া দেখেন। হাওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাতে পরিশ্রম প্রচুর হয়। নূতনত্বের মোহে দিন কতক নাড়াচাড়া করিয়া এখন হাতপাখার প্রতিই বেশি মনোযোগ দিয়াছেন। সুতরাং ওটিতে প্রচুর ধূলা জমিয়াছে। পরি-বর্ত্তনের মধ্যে হেড মাষ্টার বদল হইয়াছেন বহুবার। দ্বিতীয় ও

তৃতীয় শিক্ষকরাও বিদেশ হইতে আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী একজন মৌলবীও বহাল হইয়াছেন। এসব হইতেছে সাময়িক পরিবর্ত্তন। কখনও কালেভদ্রে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সব চেয়ে বড় পরিবর্ত্তন—যাহাতে বৈচিত্র্য বেশি আনন্দ বেশি এবং গতানুগতিক প্রথার মধ্যে নিত্য নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা ছাত্রদল ছাড়া কোথায়ই বা মিলিতে পারে? একদল উপরে উঠিয়া যায় অন্যদল বাহির হইতে আসে। আকারে ভঙ্গিতে দুষ্টামীতে ও মেধায় একদলের সঙ্গে অন্য দলের পার্থক্য কম—তবু আজ যে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া শোভা ও গন্ধের মধ্য দিয়া মনোহরণ করিল, কাল যেটি ফুটিয়া ঝরিয়া গেছে কিংবা আগামী কাল ফুটিবার আগ্রহে যে কুঁড়িটি উত্তাপে ও বাতাসে কাঁপিতেছে, এক হইয়াও প্রতিদিনের নব-বৈচিত্র্যে এদের প্রত্যেকটির পৃথক সৌন্দর্য্য যেমন মানুষকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট—ছেলেদের দেখিয়াও হরিশ মাষ্টারের মনে বার বার ওই কথাই উঠে, প্রাণের আস্বাদ আনন্দ-রূপের মধ্য দিয়াই বার বার ফিরিয়া আসে।

প্রথম যখন পাঠ-গ্রহণেচ্ছু ছেলেরা ক্লাসে আসিয়া বসে উহাদের বসিবার ভঙ্গিটাই কি কম কৌতূহলজনক! মুখে-চোখে অগাধ বিস্ময়, প্রচুর ভয়। দমকা বাতাসকে ঘরের কোণে বদ্ধ করিয়া রাখিবার দুশ্চেষ্টা কেহ করিয়া থাকেন? বিস্ময় এবং ভয়

লইয়াও উহারা প্রচুর কোলাহল করে। কোলাহলই যে প্রাণের ধর্ম্ম। টেবিলে ভাঁটের বেত আছড়াইয়া হরিশ মাষ্টার শাসনের প্রথম সূত্রটি ছেলেদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। কোলাহল ক্ষণিকের জন্য থামে তারপর পাঠ্য বিষয়কে আশ্রয় করিয়া দ্বিগুণ তেজে তাহা সুরু হয়। উচ্চ চিৎকারের মধ্যেই বিস্ময়ান্বিত নির্ব্বোধ কচি মুখগুলিতে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়া উঠে, বাহিরের কৌতুক বইয়ের পাতা আশ্রয় করিয়া ছেলেদের নিয়মের গণ্ডিতে টানিয়া আনে। দক্ষ কারিগরের হাতে ছাঁচ-মাফিক পুতুল তৈয়ারী হইতে থাকে!

নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের কৌলীন্যে উঠায়—স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ির মত ছেলেরা এখানে আসে না। হরিশ মাষ্টারের পরিশ্রম কমিয়াছে কিন্তু দায়িত্ববোধকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। নূতন ছেলে খানিকটা জ্ঞানের আলো পাইয়া আসিলেও নূতন-ফোটা ফুলের সৌন্দর্য্য ও গন্ধ তিনি উপভোগ করেন। ফুলের দুই একটি দল হয়তো ছড়াইয়াছে বাকিগুলিকে মেলিয়া দিবার ভার যাঁহার তিনিও পরম স্রষ্টার সগোত্রীয়। সৃষ্টির গৌরব হরিশ মাষ্টার করেন বৈকি।

ছেলেবেলায় সঙ্কল্প করিয়া একদা স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে পড়ে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন। স্বদেশী ব্রত গ্রহণের

দিন হাতে হলুদ রঙের রাখী বাঁধিয়া পথে পথে স্বদেশী গান গাহিয়া বেড়ানো। বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব—এই সেদিন গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের বাতাসে নূতন দীপ্তিতে মনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।

মনে হইয়াছে সে দিন বুঝি অত্যাসন্ন। ভিন্নরূপে আসিয়াছে ডাক—মনের তন্ত্রীতে বাজিয়াছে অনাহত সেই সুর। কৈশোরের সাধন সমরে ঝাঁপ-দিয়া-পড়া সৈনিক প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় বহু অস্ত্রলেখা পৃষ্ঠে বহিয়া বিস্মৃতির যবনিকায় প্রায় আত্মগোপন করিয়াছে, তবু পূবের আকাশে নব অরুণোদয়ের ছটায় সে মুগ্ধ স্বপ্নভরা চোখে পৃথিবীর পানে না চাহিয়া পারে না। অবস্থা সচ্ছল নহে ; চাকরি করার মনোবৃত্তি স্বদেশী ঢেউয়ে নিঃশেষিত ; কি আর করেন, স্বাধীনতার বনিয়াদ পাকা করিবার সঙ্কল্পে জাতি গঠনের দায়িত্ব লইয়া হরিশ অবশেষে মাষ্টারী গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারের সাচ্ছল্য যত না হউক নিজের ভগ্ন মনোরথকে এইভাবে প্রত্যাশার স্বর্ণকিরণে ঢাকিয়া পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন হরিশ। হয়তো ভুলিতেন—নূতন দিকের নূতন আঘাতে মনোবৃত্তি তাঁহার তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে—শুধু আদর্শের স্বর্ণসৌধের চারিধারে স্বপ্নের সুখ-প্রাচীর

গড়িবার কল্পনাটি দিন দিন নীতিবোধে ধর্ম্মবোধে অত্যুগ্র হইয়াছে। হরিশের মত নীতিবাদী মাষ্টার এ অঞ্চলে কম। কেহ পরোক্ষে কেহ বা ভঙ্গী-ভাষণে পরিহাস করিতে ছাড়ে না। হরিশ যে সে কথা না জানেন তাহা নয় কিন্তু মনে মনে গর্ব্বও বোধ করেন। নিজে তিনি বহ্নি নন, কতকগুলি স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টির দায়িত্ব শুধু তাঁহার; এবং সেই স্ফুলিঙ্গ সুসংহত হইয়া একটি আধারে সুবিন্যস্ত হইলে দাবানলের সৃষ্টি করিবে একদিন—এই আশ্বাসেই হরিশ পঞ্চাশের পারে হেলিয়াও জীবনকে ভালবাসেন।

২

ঢং ঢং করিয়া সাড়ে দশটায় ইস্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিতেছে। দ্বিতীয় পণ্ডিত ছাড়া প্রত্যেক মাষ্টারই আসিয়াছেন। ছেলেরাও লেট হইবার ভয়ে ছুটিয়া ক্লাসরুমে ঢুকিতেছে। হরিশ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করেন। পঞ্চাশ মিনিটে একটি পিরিয়ড; যাহাতে সামান্যতম অংশ তার অপচিত না হয় সেদিকে হরিশ মাষ্টারের দৃষ্টি প্রখর।

আপিস ঘর হইতে বাহির হইবার মুখে দ্বিতীয় পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর দেখা। হরিশকে দেখিয়া পণ্ডিত সঙ্কুচিত হইয়া কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গিতে ম্লান হাসিয়া বলিলেন, লোকগুলোও হয়েছে অবুঝ, সময় অসময় বোঝে না। আরে স্নান সেরে আসনে বসবো—হেই বাবা আমাদের লক্ষ্মী পূজোটা না হলে—

হরিশ প্রখর দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া শুধু মন্তব্য করিলেন, দু'দিকে ফাঁকি দিলে কোন দিকই ভরে না পণ্ডিত মশায়।

আজ্ঞে সেতো ঠিক—সেতো ঠিক। মুখ তুলিয়া চাহিতে গিয়া দেখেন দীর্ঘপদবিক্ষেপে হরিশ মাষ্টার ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পণ্ডিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ছোকরা গেম-মাষ্টার।

ফোর্থ মাষ্টার আপনাকে কি বলছিলেন পণ্ডিত মশায়?

পণ্ডিত অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিলেন, না—এমন কিছু নয়। লেট হয়েছে ব'লে আমিই—

ওঁর এতে বলবার কি আছে! ইস্কুলের ডিসিপ্লিন রাখছেন যিনি তাঁর কাছে আপনি কৈফিয়ৎ যদি দেবার দরকার হয়, দেবেন।

না না, এমনি বলছিলাম। বলিতে বলিতে তিনি পাশ কাটাইয়া আপিস ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কি হে সুশীল, কৈফিয়ৎ কিসের?

বলিতে বলিতে আর একজন ছোকরা মত মাষ্টার আপিস ঘর হইতে বারান্দায় আসিলেন।

সুশীল হাসিয়া বলিল, নীতিবাদের আওতায় প'ড়ে পৃথিবীর ভাল ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে অবনী।

যাক, তাতে সার হবে ভাল—জমি উর্ব্বরা হবে।

মরা জমিতে কোন ফসল ফলে না যতই কেন না সার ঢাল তার তলায়।

দুইজনে হাসিতে হাসিতে ক্লাসরুমে গিয়া ঢুকিল।

গুণিতক কি সার?

গুণিতক? গুণিতক মানে multiple. মানে, আচ্ছা বোর্ডে—কষে দেখিয়ে দিচ্ছি। খড়ি হাতে হরিশ মাষ্টার বোর্ডের নিকটে দাঁড়াইলেন। সত্য বলিতে কি আজীবনের অভ্যাস তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া পর্য্যন্ত মনটা তাঁহার খুঁত খুঁত করিতে থাকে। পরিভাষাগুলি অর্থবাচক না হইয়া অর্থনাশক মনে হয়। নিজেরই গোল লাগে, ছাত্রদের বুঝাইবেন কি। উপরের ক্লাসে যে সব শিক্ষক ভূগোল গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দেন তাঁহারা নূতন মাধ্যমে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে পরিণত বয়সে আর একবার পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। আজকাল সাধারণ লাইনে পাশ দিয়া শিক্ষকতা করিতে গেলে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ও ছেলেদের কাছে সম্মান বজায় রাখা দুষ্কর। বি. এ.-র বি. টি. না থাকিলে মাষ্টারী মূল্যহীন। এ বয়সে নূতন করিয়া পাশ দিবার উদ্যম নাই—নূতন পরিভাষা আয়ত্ত করিবার মেধারও অভাব। যে যাহা বলেন বলুন হরিশ মাষ্টার পুরাতন নিয়মেই শিক্ষা দান

করেন। নূতন হেড মাষ্টার বয়োজ্যেষ্ঠ মাষ্টারকে বার কয়েক উপদেশ দিয়াও কোন ফল পান নাই। হরিশ নিজে যাচিয়া নিম্নতম ক্লাসের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবে এক-পক্ষের মুখ ও অন্য পক্ষের মান রক্ষা হইয়াছে।

অঙ্কটা পুরা ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিয়া হরিশ বলিলেন, শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বদলেছে—উদ্দেশ্য ঠিক আছে। যাই পড় আর যাই শেখ সব শিক্ষার বড় হ'লো মানুষ হওয়া। তা ভুলবে না কোনদিন।

অল্প বয়সের ছেলেরা মানুষ হওয়ার গূঢ়ার্থ বোঝে না—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মাষ্টারের পানে চাহিয়া থাকে। মাষ্টার আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলেন, যে নিজের দেশকে চেনে না সে কাউকে চেনে না। বাবা মা হ'লেন গুরুজন তাঁদের কথা শোনাতে তোমাদের মঙ্গল। ভুলেও মিথ্যা কথা বলবে না—তাতে মনের শক্তি বাড়বে—

হেড মাষ্টার বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে এক মিনিটকাল ক্লাসের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া পড়েন। হরিশ মাষ্টারের উপদেশাবলী শেষ হইতে না হইতে ডাকেন, শুনুন হরিশ বাবু। এক মিনিট।

হরিশ মাষ্টার বারান্দায় আসিতে গলা নামাইয়া হেড মাষ্টার বলেন, যে কথা উঁচু ক্লাসের ছেলেরা বোঝেনা—ছেলের অভিভাবকরা বোঝেন না—সে কথা না বলাই ভাল।

হরিশ মাষ্টার বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলেন, বলেন কি—শিক্ষার বনিয়াদ পাকা না হ'লে—

হেড মাষ্টার অল্প হাসিয়া জবাব দেন, পাশের পার্সেণ্টেজের ওপর ইস্কুলের এডের স্থায়িত্ব। সরকারী সাহায্য বজায় রাখতে হ'লে—সরকারী বিধান মেনে চলতেই হবে। যা পাঠ্য পুস্তকে আছে তা ছাড়া অন্য শিক্ষা দিলে ইস্কুলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড নীচু হয়ে যাবে।

হরিশ মাষ্টার নীরবে তাঁহার ঊর্দ্ধতন মাষ্টারের উপদেশ শুনিলেন। প্রতিবাদ করিলেন না। করিয়া লাভ নাই। শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি চাকরিলাভের লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ হয়, পাশের হারে যদি সরকারী কৃপাকণা কিনিয়া মানুষ তৈয়ারী করিলাম বলিয়া গর্ব্ব করা শোভা পায়—সে ভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া হরিশ কোন দিন কৃতার্থ বোধ করিবেন না। স্বদেশী যুগের অগ্নিদীক্ষা তাঁহাকে ভিন্ন শিক্ষা দিয়াছে।

নীরবে তিনি ক্লাসের মধ্যে ঢুকিতেছেন—হেড মাষ্টার পুনরায় তাঁহাকে ডাকিলেন, আপনি কি বেত ব্যবহার করেন ?

না।

তবে টেবিলের ওপর আপনার বেত কেন ?

ছোট ছেলেরা প্রায়ই দুষ্টু হয়। ওদের একটু দাবে না রাখলে—

না—না—বেত উঁচিয়ে কখনো ওদের ভয় দেখাবেন না।

আপনাদের যুগে যা হয়েছে—হয়েছে। এখন শিক্ষাদানের প্রথাই হ'লো—ভালবাসা। সারা জগতে দেখা গেছে—তাতে ফল ভালই হয়েছে, বুঝলেন ?

হেড মাষ্টার চলিয়া গেলে হরিশ মিনিট কয়েক বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। পঞ্চাশ মিনিট হইতে কয়েকটি মূল্যবান মিনিট অপচিত হইল—তবু তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ জাগিল না। সত্যই কি জগৎ পরিবর্ত্তনের পথে দ্রুত চলিতেছে ? ছেলেদের বেত মারিয়া শাসন করার মধ্যে আনন্দ হয় তো নাই—কিন্তু এইটিই তো প্রথা। চঞ্চলমতি শিশুরা রাশভারি মানুষকে ডরায়। না ডরাইলে পাঠ মনে রাখিবার দায়িত্ব তার জন্মিবে কেন ? ভালবাসা না থাকিলে—শিক্ষা দেওয়া যায় না—কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে ছেলেমানুষি করিয়া শিক্ষা দেওয়াতে যে তরল ভালবাসার প্রকাশ হয়—তার মূল্য কতটুকু ? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানিয়া ওই যান্ত্রিক ভালবাসা দেখাইতেই হইবে। হাসি না পাইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে হাসা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ক্লাশে ঢুকিয়া হরিশ বোর্ডের কাছে আর গেলেন না, টেবিল হইতে বেতগাছি তুলিয়া লইয়া মাঠের দিকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সেটি সজোরে ভাঁটবনের মধ্যে ছুড়িয়া দিলেন। মনে হইল—অনেকখানি শক্তি সেই সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। অবসন্নের মত হরিশ আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

৩

স্কুলের ছুটি হইলে হরিশ আর এক মিনিটও অপেক্ষা করেন না। ফিফ্‌থ্‌ মাষ্টার মাধব ওরফে মধু মাষ্টার তাঁহার সঙ্গী হন। বয়সে দুইজনেই সমান সমান। সেকালের শিক্ষার গৌরব ঘোষণা মাধবের বেশি—এ কালকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না। প্রায়ই সেই আলোচনা করিতে করিতে পথ চলেন।

আজ ব্যাপার শুনেছ—হরিশ। আমার তো দেখে শুনে চক্ষু স্থির।

হরিশ আপন চিন্তায় বিভোর ছিলেন, ঘাড় নাড়িয়া শুধু একবার সায় দিলেন।

গাল টিপলে দুধ বেরয় সব কচি ছেলে—সিগারেট টানতে শিখেছে! বাঁশ বনের ধারে দেখি—গুপি মিত্তিরের ছেলে হাবুল—হরেন গোঁসাইএর নাতি সুবল দু'জনে মিলে বোঁ বোঁ করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

ছেলে দু'টো ক্লাস ফোর'এ পড়ে না?

হাঁ—দেখে ধমক দেব কি—

ধমক! কান ধ'রে আচ্ছা ক'রে গোটাকতক চড় কসিয়ে দিতে পারলে না। না হয়—বেত না ভেঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে হরিশ মাষ্টার থামিয়া গেলেন। বিধি-বিধান বদলাইয়াছে—বেত এখন অচল।

মাধব বলিলেন, বেত—কানমলা—এমন কি কড়া ধমক পর্য্যন্ত দিতে হেড মাষ্টার বারণ করেছেন। শাসন না ক'রে আলুনি পড়ানোতে ছেলেদের বিদ্যেও যা হ'চ্ছে!

হরিশ বলিলেন, আচ্ছা মাধব ভায়া, তোমারো কি বোধ হয় না—আগেকার মত ছেলে তৈরী আর হচ্ছে না। অগ্নি-যুগের কথা ভাব—ক'টা সুরেন বাঁড়ুজ্জে—রবি ঠাকুর—সি-আর-দাশ—বিপিন পাল জন্মেছে!

মাধব বলিলেন, আমাদের কালে সে এক দিন গেছে!

মাধবের দীর্ঘনিশ্বাসে হরিশও অতীতকালের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। সেইদিন জীবনে আসিয়াছিল বলিয়া আজও তিনি বাঁচিয়া আছেন। স্মৃতি মানুষের পক্ষে সঞ্জীবনী সুধা। কোন কোন মানুষের পক্ষে তো বটেই।

খানিকটা দূর আসিয়া মাধব বলিলেন, তোমার ছেলেকে নাকি কলকাতায় পাঠিয়েছ কলেজে পড়তে?

হরিশ মাথা নাড়িলেন।

পারবে খরচ যোগাতে ?

হরিশ ছোট একটি নিশ্বাস বুকের মধ্যে টানিয়া কহিলেন, উচ্চ আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে—নইলে কি নিয়ে থাকবো ভাই।

তা ছেলেটি তোমার ভাল। সবগুলিই ভাল।

হরিশ বলিলেন, প্রাণপণে ওদের মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছি ভাই—।

তা মানুষ ওরা হবেই। শুনলাম এরি মধ্যে প্রাইভেট টুইশন একটা জুটিয়ে নিয়েছে—আর একটা নেবার চেষ্টা করছে।

আর একটা ? না—না—তাতে ওর ক্ষতি হবে। পড়াটা আর পড়ানোটা মোটেই ব্যবসা নয়। শুধু পাস করিয়ে দিলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। আমি ওকে চিঠি লিখে বারণ ক'রে দেব।

তুমি কোথা থেকে দেবে খরচ! নিজে তো দু'টির বেশি তিনটি ছাত্র নেবে না।

নিই কি ক'রে ভাই। আমার সামর্থ্যে যা কুলোয় তাই নিয়েছি। বেশি নিয়ে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে ওদের ফাঁকি শেখাবো না।

কিন্তু অনেকেই তো করেন।

হরিশের স্তিমিত চোখের দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কথায় বেগ দিয়া কহিলেন, ওঁরা বলেন যেমন ক'রে হোক

বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ, নয়? কিন্তু আমি বাঁচলেই সব বাঁচবে? বাঁচবে আমাদের সংস্কৃতি? আমার ভারতবর্ষ?

মাধব বলিলেন, অত কে ভাবে! আমিকে রক্ষা করাই তো বড় কাজ।

সবাই তাই বলেন, নয়? হরিশের মুখে তিক্ত হাসি।

মাধব বলিলেন, বলেন সাধে! ইস্কুল যদি ঠিকমত মাইনে দেয় মাষ্টারকে—মাষ্টারের অন্য উপায় খুঁজতে হয় না।

গরিব দেশের—গরিব ছেলে। অভিভাবকরা সবাই গরিব—বেশি মাইনে দেওয়া সম্ভব নয়।

কেন—সরকারী সাহায্যে তো—

সরকার! কোন্ দেশের সরকার—মাধব? তোমার দেশ আলোয় এলো কি আঁধারে রইলো সে মাথা ব্যথা কার!

তবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কেন? ইস্কুল কলেজ উঠিয়ে দিলেই তো পারে।

হরিশ হাসিলেন, সভ্যতার বালাই অনেক। পৃথিবীতে ওরাই একমাত্র জাতি নয় যারা স্বাধীন। নিজেকে সবচেয়ে সভ্য ব'লে বড়াই করা এটাও দরকার। আর তা ছাড়া শিক্ষার গোড়াপত্তন কেন করল ওরা তাও তো জান। নিজেদের রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাবার জন্যই তো। যেমন পেতেছিল

রেল লাইন। ভারতবর্ষের তুলো রপ্তানী ভালভাবে হ'লে—ম্যানচেষ্টারের কল চলবে পুরোদমে—তাই না? গরজে যেমন ঢেলা বওয়ার রীতি, ওদের শিক্ষাদানের মহত্ত্বটা সেই জাতীয়। আচ্ছা আসি।

মাধব অভ্যাসবশতঃ হাত উঠাইয়া নমস্কার করিতেছিলেন—হরিশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তোমাকেও সভ্যতার ভূতে পেয়েছে—মাধব। খেলার সাথীকে নমস্কার!

মাধবও হাসিলেন, অভ্যাসের দোষ ভাই, হাঁ—ভাল কথা—পাল বাড়িতে যে ছেলেটি তোমার কাছে পড়তে চেয়েছিল—

তোমার আশা নেই ভাই—সেটিকে সুশীল মাষ্টার নিয়েছেন।

৪

সরু একটি গলির মধ্যে বাড়ি।—গলিটার দু'ধারে নোনা আতা—কালকাসুন্দা ধলা আঁকড়া ও কচু গাছের ঝোপ। বর্ষার পর গাছগুলি কাটিয়া দিলে সারা শীত ও সারা গ্রীষ্মকাল জমিটা পরিষ্কার থাকে—কিন্তু বর্ষার জলে ওগুলির স্বাস্থ্য বার বার অস্ত্রাঘাত করিয়াও ক্ষুণ্ণ করা যায় না। সে চেষ্টাও কেহ করেন না। বাড়িটাও এমন কিছু সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে যে—বনের মধ্যে বেমানান দেখায়। বহু পুরাতন পাতলা ইঁটের ছাদ, নীচু দু'খানি জরাজীর্ণ কোঠাঘর। দেওয়ালে নোনা ধরিয়াছে—কোথাও বা ইঁট খসিয়াছে। ভিতরের কড়ি বরগা-গুলি উপরের ছাদকে অতি কষ্টে আসন্ন পতন হইতে রক্ষা করিতেছে। বর্ষার দৌরাত্ম্যে ঘরের কোণ বাছিয়া তক্তা-পোষটিকে টানিয়া বেড়াইতে হয়। তক্তাপোষেরও বার্দ্ধক্য সুপ্রকট। একটিও পায়া নাই—সাজানো ইঁটের উপর সেটি দাঁড় করানো।

মাধব মাঝে মাঝে রহস্য করিয়া বলেন, তোমার তক্তাপোষ দেখলে আমার দাঁতের কথা মনে পড়ে। চাল ছোলা ভাজা খাওয়াটা আজ স্বপ্নই হয়েছে।

কেন—বাঁধিয়ে নাও না।

ওই ইঁট ঠেক্‌নো দেওয়ার মতো ? ওতে তো পয়সা লাগেনি—কিন্তু দাঁতের দামে আমার মাষ্টারি বিকিয়ে যাবে ভাই।

সংসারের বস্তুমূল্যে মানুষ চিরকালই বিকাইয়া যাইতেছে। তাহারই এক নাম জীবন-সংগ্রাম। হরিশ বলেন, মানুষ বিকাইয়া গেলে—সংসারের মূল্য আর কতটুকু। জীবন তো সংগ্রামের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তাহার কি-ই বা উদ্বৃত্ত থাকে।

উঁচু রোয়াকের উপর দিয়া বাড়ি ঢুকিবার পথ। রোয়াকের দিকে যে দুয়ারটি আছে—তাহার কড়া নাড়িতে যাওয়া বৃথা, কারণ কড়া নাই। শাল-কাঠের দুয়ার হাঁসকল ও ডোমনির সাহায্যে কোন রকমে খাড়া আছে ; উইয়ে সেটি ফোঁপরা করিয়া দিয়াছে। হরিশ মাষ্টারের জুতার শব্দ রোয়াকে উঠিতেই দুয়ার খুলিয়া গেল। একটি সাত বছরের উলঙ্গ শিশু রোয়াকে আসিয়া হাসিমুখে ডাকিল, বাবা।

হরিশ তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া একটু আদর করিয়া কহিলেন, তোমার দাদারা কোথায় দেবু ?

মেজদা পড়াতে গেছেন—সেজদা আর ন'দাতে মিলে জল তুলছেন।

তুমি আজ পড়তে যাওনি ?

মাষ্টার মশায়ের কে কলকাতা থেকে এলেন ব'লে আজ আমাদের ছুটি।

আচ্ছা, আমার কাছে পড়বে এসো।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই দেওয়ালে রক্ষিত একটি বিবর্ণপ্রায় ফটোর সম্মুখে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিলেন। সাধারণ লোকে দেখিলে বলিবে—ময়লা কাচের ফ্রেমে আটকানো ঘষা কাগজ একখানা। ওখানির উপর এত শ্রদ্ধা ও মমতা পোষণ করা হাসির কথা। কিন্তু বাহিরের মূর্ত্তি অস্পষ্টপ্রায় হইলেও মনের আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি আছে—তাহা হরিশের জীবনান্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতে মুছিবে না। ও মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া সমস্ত দেবতাকে প্রসন্ন করা যায়। ওখানি হরিশের পিতৃদেবের ফটো।

ফটোর বামপাশের কুলুঙ্গিতে আর একবার মাথা ঠেকাইলেন হরিশ। অতি পুরাতন বিবর্ণ ছেঁড়া জুতা একজোড়া; এটিও পিতৃদেবের স্মৃতি।

হরিশের দেখাদেখি ছেলেটিও দেওয়ালে মাথা রাখিল।

হরিশ বলিলেন, প্রার্থনা কর দেবু যেন ওঁর মত হতে পার।

দেবু চোখ বুজিয়া মনে মনে হয়তো সেই প্রার্থনাই করিল।

পরে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরদা কোন্ ইস্কুলে পড়াতেন—বাবা?

রাজ স্কুলে। ওঁর হাত দিয়ে বড় বড় সব লোক—যাঁরা এককালে বাংলার মাথা ছিলেন—মানুষ হয়েছেন। উনি কোন দিন বিদেশে যান নি—কারো কাছে ঋণ করেন নি—কখনও মিথ্যে কথা বলেন নি।

বল না বাবা ওঁর গল্প? দেবু আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল।

ওঁর গল্প! না দেবু, ওঁর কথা আমার কাছে গল্প নয়, পরম সত্য। কয়েক মিনিট চোখ বুজিয়া যেন সেই মহিমাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া হরিশ কহিলেন, শোন বলি। আমরা তখন খুব ছোট; একটা জমি নিয়ে মামলা হচ্ছিল তখনকার ইস্কুলের যিনি সেক্রেটারি তাঁর সঙ্গে দত্ত বাবুদের। দত্ত বাবুরাও পয়সাওয়ালা লোক, মস্ত তেজারতি কারবার তাঁদের। কলকাতার বড় বাজারে ভূষিমালের আড়ৎ ছাড়াও চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাঁধা দিয়ে টাকা ধার দিতেন ওঁরা। ইস্কুলের সেক্রেটারি যিনি ছিলেন—তিনি খানিকটা জমি বন্ধক দিয়ে ওঁদের কাছে ধার নিয়েছিলেন টাকা। তাই নিয়ে বাধল মামলা। ইস্কুলের সেক্রেটারি বাবার কাছে এসে

বললেন, আপনাকে সাক্ষী মানব আমরা, জমিটা যে দেবোত্তর এটা প্রমাণ করতে হবে।

এখন ব্যাপার কি জানিস? জমি যদি দেবোত্তর অর্থাৎ দেবতার সম্পত্তি এ প্রমাণ হয় তা হ'লে বন্ধকী মামলা নাকচ হয়ে যাবে। কেননা—দেবতার সম্পত্তি বন্ধক—বা বিক্রয় হস্তান্তর করবার ক্ষমতা ওয়ারিশানদের নেই।

বাবা বললেন, সে কি ক'রে হবে? জমি তো দেবোত্তর নয়?

উনি বললেন, আপনি তো জানেন—কর্ত্তা একবার বলে-ছিলেন—ওটা দেবোত্তরে দেবেন। উইলও যেন কি করেছিলেন—আপনি তার সাক্ষী ছিলেন।

বাবা বললেন, হাঁ সঙ্কল্প করেছিলেন বটে, কার্য্যে কিছু হয় নি। সে উইল যেন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তা হোক—ওঁর সঙ্কল্প যে ছিল এতো জানেন আপনি, তাই বলবেন আদালতে।

বাবা হেসে বললেন, এ হ'ল সত্য গোপন করা। আমি যদি সাক্ষী দিই সমস্তই খুলে বলব।

সেক্রেটারি চটে গেলেন। বললেন, জানেন—এতে আপনারও কম ক্ষতি হবে না।

বাবা বললেন, তাই ব'লে মিথ্যা বলব!

সেক্রেটারি শাসালেন, আপনার আম বাগান—যা বন্ধক রয়েছে আমাদের কাছে—দেনার দায়ে বিক্রী করিয়ে নেব।

বাবা কোন উত্তর দিলেন না। শেষ অবধি জমি-বন্ধকের মামলাটা আপোষ-নিষ্পত্তি হ'ল, আমাদের আম বাগানটাও হস্তান্তর হ'ল।

কেন বাবা?

পয়সাওয়ালা লোকের রাগ কে ঠেকাবে বাবা! —বাবা কিন্তু মাথা নোয়াননি ওদের কাছে কোন দিন। তখন আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। দেনার দায়ে সর্ব্বস্ব গেছে —বাড়ীঘরদোরও বাঁধা পড়ে পড়ে। সামান্য ইস্কুল-মাষ্টারী আয়ে কোন গতিকে—একবেলা খেয়ে সংসার চলছে। কলকাতা থেকে বাবার এক আত্মীয় খবর দিলেন—শীগ্‌গির চলে এস এখানে—সায়েবের আপিসে একটা ভাল চাকরি খালি আছে। যা মাইনে পাচ্ছ মাষ্টারীতে তার চারগুণ পাবে। বাবা লিখলেন, মাপ করবেন। প্রথমতঃ—বিদেশীর দাসত্ব করবার ইচ্ছে আমার নাই, দ্বিতীয়তঃ—প্রবাসবাসের কল্পনা কোন দিন করিনি। যে কাজ হাতে নিয়েছি—তা শুধু উদরান্ন সংস্থানের জন্য নয়। আমার দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে—হবে সত্যাশ্রয়ী—সাহসী—জ্ঞান-তপস্বী। তারা ধনের উপাসক হবে না—হবে সত্যের উপাসক। যে সত্যবলে ভারতবর্ষ

একদিন পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু ছিল—সেই সত্যলাভের সন্ধান দিতে হবে আমাদের। আমরা যদি ধনের লোভ করি তো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব যে। আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়ে গেলেন বাবা, একদিনও ওঁর মুখে দুঃখের ছায়া দেখিনি। কোনদিন ওঁকে বলতে শুনিনি—এর চেয়ে যদি চাকরি নিতাম! উনি বলতেন, সুখ দুঃখ হ'ল বাইরের জিনিস—আজকের যা দুঃখ কালকের তা দুঃখ নয়—আজকের সুখও অন্য দিনের আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। উদাহরণ দিতেন, বড়লোকের গাড়ী চড়ার সঙ্গে গরীব লোকের পায়ে হাঁটার। উপমা দিতেন, আহারে—পোষাক পরিচ্ছদে—মান সম্মানে—। একবার একটি ভারি মজার ঘটনা হয়েছিল। তখনকার ইস্কুলের যিনি সেক্রেটারি ওঁর কাকা বড়দিনের সময় রায় বাহাদুর উপাধি পেলেন। উপাধি পেয়ে খুব ধুমধাম ক'রে লোকজন খাওয়ালেন—বাজী-রোশনাই পোড়ালেন—যাত্রা কীর্ত্তন দিলেন। একজন চাষা নেমন্তন্ন খেতে এসে বললে, কই বাবু—আপনি কি পেয়েছেন দেখি? বাবু বললেন, সে জিনিস দেখাবার নয়। —তবে! মানেটা তাকে বুঝিয়ে দেয়া হ'ল। তাতে সে একটুও আহ্লাদ করল না। বললে, এরই জন্য এত কাণ্ড! আমরা বলি না জানি কি হাতী ঘোড়া সোনা-দানা বুঝি! একটা নামের জন্য 'এত!

যা নিয়ে একবেলাকার অন্ন জোটে না—যা দেখিয়ে মানুষকে হকচকিয়ে দেয়া যায় না—যা সম্পত্তির মত বাক্সে সিন্দুকে রাখার উপায় নেই—তা নিয়ে আবার জাঁক ! রাম বল।

দেবু হেসে উঠল।

চাষা কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিল, দেবু। এই যে সব মান সম্মানের সৃষ্টি—এর কোন দাম নেই। যে সমাজে আছে—সে সমাজ মানুষেরই তৈরী—ভগবানের তৈরী নয়। ওর ওপরটা চকচকে পালিশ করা—ভিতরটায় খড় আর ন্যাকড়া। সব ভূয়ো।

এসব হ'ল কেন, বাবা ?

সে অনেক কথা। বড় হ'লে একদিন বুঝবে। তবে এইটুকু জেনো, মেরুদণ্ড যার খাড়া নয়—ধন বা সম্মান তাকে উঁচু ক'রে রাখতে পারে না। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য সে উঁচুতে থাকে—বেশীক্ষণের জন্য নয়। তুবড়ী ফুল কেটে ওপরে ওঠে—হাউই তার চেয়েও ওপরে ওঠে—কিন্তু ওপরে থাকতে পারে না। এদের শব্দ বেশী—রোশনাই বেশী—হৈ হল্লাও খুব। আর ছোট্ট মিট্‌মিটে একটি নক্ষত্রকে দেখ—ওপরে ঠেলে ওঠার চেষ্টা তার নেই—সে শব্দ করে না—রোশনাই দেখায় না—কাউকে বিরক্ত না ক'রে একই জায়গায় তার আলোটি বিছিয়ে রাখে। তোমরাও এই ছোট তারকাটির মত হতে চেষ্টা করবে।

দেবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দেবু ডাগর দুই চোখে বিস্ময় ভরিয়া হরিশের পানে চাহিয়া রহিল।

একটি মিনিট নিঃশব্দে কাটিল।

জল খাবে না? একজন প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রৌঢ়ার রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ না হইলেও মুখে সরল-প্রসন্নতার জ্যোতি। কর-প্রকোষ্ঠে দু'গাছি শাঁখা—পরণে অর্দ্ধছিন্ন একখানি লাল পাড় শাড়ি। কাপড় ছিঁড়িলেও—পাড়টি এখনও লাল টুক্‌টুকে আছে। সীমন্তের সিন্দূর-শোভাকে তাহা উজ্জ্বলতর করিয়াছে।

অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। হরিশ কহিলেন, না—আজ একেবারে ভাতই খাব।

আজ কিন্তু তরকারী নেই।

তরকারী! কি হবে তরকারী! নুন আছে তো?

ঘাড় হেলাইয়া প্রৌঢ়া পিছন ফিরিলেন।

ছেলেটি বলিল, ভাতের সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেশ লাগে বাবা।

ছেলেটির মুখের পানে চাহিয়া হরিশ বলিলেন, তুমি পান খেয়েছ দেবু? কোথায় পেলে?

দেবু অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া কহিল, ও-বাড়ির মাসীমা এসেছিলেন বেড়াতে—

ছিঃ—পান খাবে না। পান খেলে জিভ মোটা হয়—ভাল পড়া বলতে পারবে না।

মাসীমা তাঁর মুখ থেকে পান দিলেন—

আচ্ছা—মুখটা ধুয়ে ফেলগে। ছাই দিয়ে বেশ ক'রে ঘসে ঘসে দাঁত মেজে এসো। কেমন?

দেবু চলিয়া গেল।

ভিতরের রোয়াকে একখানি মাতুর বিছানো ছিল। মুখহাত ধুইয়া হরিশ তাহাতে বসিলেন। দশ-এগারো বছরের একটি মেয়ে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাখাখানি ভাঙ্গা। বাতাসের চেয়ে শব্দই হইতেছিল বেশি। হরিশ হাসিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া মাতুরের একপ্রান্তে বসাইয়া কহিলেন, তুমি নাকি শিবপূজোর মন্ত্র শিখে ফেলেছ? বলতো—শুনি।

মেয়েটি গড়গড় করিয়া ধ্যানমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া গেল। একটানা সংস্কৃত উচ্চারণে বিশুদ্ধতা বজায় রহিল না, হরিশ সংশোধন করিয়া দিলেন।

মেয়েটির নাম দুর্গা। ধ্যান ও প্রণাম-মন্ত্র আবৃত্তি করা হইলে বলিল, আচ্ছা বাবা—শিব সবচেয়ে বড় দেবতা—নয়?

হরিশ হাসিয়া বলিলেন, হাঁ—উনি হ'লেন মঙ্গলময়, যদিও

ধ্বংসের দেবতা ব'লে আমরা ওঁকে ডরাই। ধ্বংস না থাকলে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য তো বজায় থাকতো না মা।

দশ বছরের মেয়ে দুর্গা অত কথা বুঝিল না—বাবার পানে চাহিয়া বলিল, ওঁদের গল্প বলবে বাবা?

গল্প হ'লেও সত্যি। শোন তবে। হরিশ পৌরাণিক গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। দেবু আসিয়া মাদুরের প্রান্তে বসিল। সেজ ও ন' ছেলে বিষ্ণু ও শিবু একটু দূরে বসিয়া সে কাহিনী শুনিতে লাগিল। বহুবার শোনা কথা—তবু হরিশের মুখে প্রতিবারই নূতন শোনায়। গলার স্বরটি হরিশের উদাত্ত এবং গম্ভীর। দেবমহিমার ধ্বনিতরঙ্গে তাহা অপরূপ শোনায়। কাহিনী শুধু মস্তিষ্ক হইতে উঠিয়া কণ্ঠের আশ্রয়ে বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে না, হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উৎস হইতে তাহা উৎসারিত হয়। সেকালের লোকযাত্রার সুমোহন ছবি—দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত এই সংসারের উপর সান্ত্বনার স্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

৫

হরিশ বলিলেন ঃ

'একবার দেবলোকে কেমন যেন সব হতশ্রী হয়ে গেল—নরলোকে হ'ল দারুণ অন্নকষ্ট। ক্ষেতে শস্য নেই, গরুর বাঁটে দুধ নেই, মানুষ বা দেবতা কারও মুখে হাসি নেই। সবাই তো ভেবে আকুল, বিশেষ ক'রে দেবতারা। তাঁদের হ'ল চির আনন্দের দেশ—আমাদের যেমন অন্ন, ওঁদের তেমনি আনন্দ—জীবন যাপনের প্রধান উপকরণ। ওঁরা ভাবতে লাগলেন—হঠাৎ কেন এমন হ'ল? গেলেন সব পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমন হ'ল? ব্রহ্মা ধ্যানযোগে সমস্ত হৃদয়ঙ্গম ক'রে বললেন, সবই বুঝলাম। লক্ষ্মী তোমাদের ছেড়ে গেছেন—তাই এমন অবস্থা।

সেকি—লক্ষ্মী কেন আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন? তিনি গেলেনই বা কোথায়?

ব্রহ্মা বললেন, দেবরাজ, এর জন্য তুমিই তো দায়ী।

দেবরাজ বললেন, সেকি পিতামহ, আমি যে তাঁর নিত্য আরাধনা করি—সুরপুরীতে তিনি তো অচলা।

না—কিছুদিন আগেকার কথা স্মরণ কর। একদিন সকাল বেলায় তুমি হাতীতে চড়ে মন্দাকিনীর ধারে চলেছিলে—মহর্ষি দুর্ব্বাসার সঙ্গে পথে দেখা। তুমি হাতীর উপর থেকে মুনিকে শ্রদ্ধা জানালে—মুনিও প্রীত হয়ে তাঁর হাতের মন্দার কুসুমের মালাটি তোমায় আশীর্ব্বাদী দিলেন। তুমি সে মালা নিজের গলায় না প'রে—তোমার প্রিয় গজের দন্তের উপর স্থাপন করলে। গজরাজ তৎক্ষণাৎ সেই মালা শুঁড়ে উঠিয়ে নিয়ে তার পায়ের তলায় ফেললে। দেখে ক্রোধ হ'ল মহর্ষির। তোমায় অভিশাপ দিলেন—যেমন আমার প্রসাদী মালার অবমাননা করলে—অচিরে তুমি লক্ষ্মীভ্রষ্ট হও। এ তাঁরই অভিশাপের ফল দেবরাজ।

তাইত পিতামহ, এখন উপায়! কোথায় আছেন মা লক্ষ্মী?

তিনি ত্রিজগৎ ছেড়ে সমুদ্রের মধ্যে আত্মগোপন করেছেন। চল নারায়ণের কাছে—তিনি অবশ্য লক্ষ্মীলাভের উপায় ব'লে দেবেন।

সব শুনে নারায়ণ বললেন, তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে দেবরাজ। স্বর্গের তোমরা আর মর্ত্ত্যের অসুররা সবাই মিলে সমুদ্র মন্থন করগে। মন্থনের ফলে শুধু লক্ষ্মী নয় আরও বহু

ধনরত্ন উঠবে—যার ফলে স্বর্গমর্ত্ত্য ধনসমৃদ্ধ হবে। কিন্তু সমুদ্র মন্থন কর বললেই তো আর সমুদ্র মন্থন করা সম্ভব নয়। কোথায় মন্থন-দণ্ড? কোথায় তার রজ্জু? দণ্ড স্থাপনের কঠিন আধারই বা কোথায়? বিষ্ণু বললেন, নিয়ে এস মন্দার পর্ব্বত —পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পাহাড়, বাসুকীকে স্তুতি কর—। ওই পাহাড় হবে মন্থন-দণ্ড—বাসুকী হবে রজ্জু। আর দণ্ডাধার? কেন—বিরাট কূর্ম্ম রয়েছেন পাতালে—তাঁকে প্রসন্ন কর। সব যোগাযোগ হ'ল—দেবতা আর অসুররাও মিলল। কিন্তু এই বিরাট মন্থন-দণ্ড চালনা করার শক্তি কোথায়? বিষ্ণু দিলেন তেজ—যে তেজের অংশে বিশ্বজগৎ প্রাণময়—দেবতারা ধরলেন বাসুকীর লেজের দিক—অসুররা মাথার দিক। আরম্ভ হ'ল মন্থন। সমুদ্রের জল তোলপাড় হয়ে উঠল—বজ্রনির্ঘোষ তুল্য শব্দ হ'ল—কত জলজন্তু দেহত্যাগ করল—জল-ঘর্ষণ-জনিত আগুনের বন্যায়। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। সেই সঙ্গে শ্রমের মূল্য পেলেন এঁরা। সমুদ্র থেকে একে একে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব—ঐরাবত গজ, অমৃত-কুম্ভ কক্ষে ধন্বন্তরী, কৌস্তভ মণি—অগণিত মণিমুক্তা সব উঠল। জলাধিপতি ভীত হয়ে ভেট নিয়ে চললেন বিষ্ণুর কাছে। ভেট আর কিছু নয়—এক পরমাসুন্দরী কন্যা—নানা অলঙ্কার ভূষিতা। তাঁকে চতুর্দ্দোলায় চাপিয়ে জলাধিপতি এলেন বিষ্ণুর কাছে। বললেন,

রক্ষা করুন। এই পরমাসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ ক'রে আমার সলিল রাজ্যকে রক্ষা করুন। বিষ্ণু আজ্ঞা দিলেন, বন্ধ হোক সমুদ্র-মন্থন।

মন্থনে ক্ষান্তি দিয়ে দেবতারা রত্ন ভাগ ক'রে নিলেন। ইন্দ্র নিলেন ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, বিষ্ণুকে দিলেন কৌস্তভ মণি, অন্যান্য দেবতারা নিলেন বহু মণি রত্ন। অসুররা দেখলে ভাল ভাল জিনিস সবই ওঁরা নিয়ে নিচ্ছেন—ওরা আর কি করে, অমৃতের কুম্ভটি কেড়ে নিলে দেবতাদের কাছ থেকে। এই নিয়ে বাধল গোলমাল।

এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে। যখন সমুদ্র মন্থন হচ্ছিল—সেই সময় নারদ ছুটেছেন কৈলাসে—মহাদেবের কাছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখা। নারদ প্রণাম ক'রে বললেন, এদিকের খবর আপনি কি কিছুই জানেন না! কি খবর? সমুদ্র মন্থনের। দেবতা আর অসুরে মিলে সমুদ্র মন্থন ক'রে কত রত্ন তুলেছেন। হাতী, ঘোড়া, কন্যা, মণিমাণিক্য কত কী। সব দেবতায় মিলে ভাগ ক'রে নিলেন—সে সব। আশ্চর্য্য তো—আপনাকে এ বিষয়ে কিছু জানালেন না—বা আপনাকে কোন কিছু দিলেন না। আপনি হচ্ছেন সব চেয়ে বড় দেবতা—আপনাকেই অবহেলা! দেখে ভারি কষ্ট হ'ল আমার—তাই খবরটা দিতে এলাম।

শিব শুনে হেসে বললেন, বেশ তো—ওঁরাই নিন রত্ন, আমি কি করব ওসব নিয়ে!

মা-দুর্গার আর সহ্য হ'ল না। রাগ ক'রে বললেন, তা বৈকি! তোমার দু'কানে ধুতরোর ফুল—তুমি কি করবে মণিকুণ্ডল? তোমার গলায় হাড়ের মালা—কৌস্তভ মণির কি দাম তোমার কাছে? তোমার বাহন বুড়ো একটি ষাঁড়—উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত রাখবে কোথায়? বড় দেবতাই বটে! না হ'লে এত ধনরত্ন ভাগ হয়ে গেল—এত সলা পরামর্শ—তোমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না। জানি তুমি নির্লোভ—কিন্তু তার সম্মানই বা দিচ্ছে কে!

শুনে শিবের হ'ল রাগ। কি—এত বড় কথা—আমায় অসম্মান! বেশ—চললাম আমি। এবার সমুদ্র মন্থন করিয়ে যা কিছু উঠবে সব আমার।

নারদকে নিয়ে শিব যখন এলেন সমুদ্রের ধারে—তখন অমৃতের ভাগ নিয়ে দেবতা অসুরে ঝগড়া পেকে উঠেছে। শিব হুঙ্কার দিলেন—মন্থন করো সমুদ্র।

দু'পক্ষই শ্রান্ত। বললে, একটুও শক্তি নাই দেহে—ক্ষমা করুন।

শিব রুদ্র হয়ে উঠলেন, বললেন, মন্থন করতেই হবে। নইলে ধ্বংস করব সৃষ্টি।

উনি সংহারের দেবতা, সব পারেন। উঠে বসল সবাই। মন্থন-দণ্ড—রজ্জু—ঠিক ক'রে নিয়ে চালালে মন্থন। সমুদ্র বহুক্ষণ ধ'রে আলোড়িত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে ছিল—এবার ঘর্ষণে তাতে জ্বলে উঠল আগুন, বাসুকির দেহচর্ম্ম ছিন্ন-ভিন্ন রুধিরাক্ত হয়ে গেল, তার মুখ দিয়ে গরল উঠতে লাগল। পাহাড়ও ঘর্ষণে ঘর্ষণে অগ্নিময় হ'ল—আর পরিশ্রান্ত দেবাসুরের ঘর্ম্ম থেকেও তৈরী হ'ল হলাহল। এই চার হলাহল এক হয়ে সমুদ্রের গর্ভ থেকে একটা ঘন ধোঁয়ার বাষ্প ঠেলে উঠল আকাশের দিকে। যেমন নীল রং তার—তেমনি প্রখর জ্বালাময় উত্তাপ—। সে প্রচণ্ড উত্তাপে সব কিছু জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। আকাশ থেকে সেই ধূমকুণ্ডলী ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে লাগল চরাচরে। ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল চারিদিকে। সৃষ্টি যায়—রক্ষা কর—রক্ষা কর। দেবতারা শিবের চরণে লুটিয়ে বললে, রক্ষা করুন দেব!

শিব ভাবলেন, এ তো আমারই প্রাপ্য। আমি মনস্থ ক'রে এসেছিলাম—এবার সমুদ্র মন্থনে যা কিছু উঠবে সবই আমি নেব। এই মহা হলাহল আমারই প্রাপ্য। সমুদ্রের ধারে যোগাসনে ব'সে শিব গণ্ডূষে টেনে নিলেন সেই মহা বিষ। আচমন ক'রে পান করলেন সেই গরল। উদরস্থ করলেন না, কণ্ঠদেশে রক্ষা করলেন তাকে। বিষের ক্রিয়ায় ওঁর কণ্ঠ হ'ল নীল। ওঁর নাম হ'ল নীলকণ্ঠ। এই পরম মঙ্গলময় দেবতাই

আমাদের হিন্দুদের উপাস্য। যিনি সমস্ত অশিব নাশ ক'রে জগতের মঙ্গল সাধন করেন।'

কাহিনী শেষে মন্তব্য করিলেন হরিশ।

ছেলেরা স্তম্ভিতের মত বসিয়া সেই কাহিনী শুনিতেছে। স্থানকালের ব্যবধান মুছিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে বিষ্ণু বলিল, বাবা—নরেশদা বলেন—যে কাল চলে যায় তা আর ফিরে আসে না।

নরেশদা কে? ও—হরিঘোষালের মেজ ছেলে—যে প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। কোন্ ইয়ার?

এবার ফাইন্যাল দেবে।

হরিশ বলিলেন, কলকাতার কলেজগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়—তা আমাদের ভারতবর্ষের উপযোগী নয়।

কেন বাবা, ওই শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিয়েই তো পৃথিবীর সভ্যতা—সংস্কৃতি।

আমি শুধু বলেছি—ভারতবর্ষের উপযোগী নয়। ভারতের লোক কোনদিন চাকরি করবে ব'লে লেখাপড়া শিখতো? পাস ক'রে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছে কোনদিন? অর্থকরী বিদ্যাকে সে তুচ্ছ ক'রে এসেছে চিরদিন।

কিন্তু বাবা, অর্থ না হ'লে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ কোথায়?

ছিল রে ছিল একদিন। আমাদের সে সুযোগ কেন নেই

আজ সেইটেই তো জানতে বলি তোদের। আমাদের দেশ রয়েছে—রাজ্য কোথায়? শাসন রয়েছে—কতক শোষণে—কতক পোষণেও হয়তো—কিন্তু মঙ্গল-ইচ্ছা তার মধ্যে নেই। ওরে—পঞ্চব্যঞ্জন—ভাত—লুচি কিছুরই অভাব নেই—নেই শুধু নুন।

ছেলে আর কোন প্রশ্ন করিল না। অতঃপর যে প্রসঙ্গ উঠিবে—সে তো জানা। স্বদেশী যুগের অরবিন্দ আসিবেন—আসিবেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—সুরেন্দ্রনাথ—বিপিন পাল—বরিশালের অশ্বিনীকুমার, চিত্তরঞ্জন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গান কণ্ঠে ভরিয়া ভাগীরথী-স্নাত স্বদেশ-ভক্ত ছেলের দল হাতে হলুদ রঙের রাখী বাঁধিয়া দলে দলে চলিবেন টাউনহলের দিকে। 'বন্দেমাতরম্' গানে দিক্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে। পৌরাণিক চিত্রের পাশে এই চিত্রও উজ্জ্বল হইয়া আছে।

সন্ধ্যে হ'য়ে এলো খাবে না? রন্ধনশালা হইতে প্রৌঢ়া প্রশ্ন করিতেছেন।

আজ কি তিথি? শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী নয়? চাঁদের আলোয় ব'সে ব'সে বেশ খাওয়া যাবে।

না-না—খেয়ে নাও। কখন বেলা দশটায় দু'টি ভাত মুখে গুঁজে ইস্কুলে গেছ—

শুক্লপক্ষ দেখলেই 'বন্দেমাতরম্' গানের সেই লাইনটি মনে পড়ে—

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদলশোভিনীং—

খেতে আর ইচ্ছে হয় না।

খাওয়া শেষ হইলে হরিশ বলিলেন, ইচ্ছে করে রাত জেগে খানিকটা পড়ি। পিদীমে তেল নেই—না?

না। কাল—

বুঝেছি—বুঝেছি—রান্নার চালও নেই! দেখ রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট—এ কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

রাজার কি দোষ। সংসারে আয় না থাকলে এমন ধারা তো হবেই। তুমি ইচ্ছে করলে আর দুটো ছেলে পড়ানোও তো নিতে পার।

পারি, নয়? হরিশ অদ্ভুত স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে মানুষের চোখের দৃষ্টি ভাগ্যে দেখা যায় না!

দয়াময়ী কণ্ঠে জোর দিয়া কহিলেন, পারই তো। সবাই বলে।

হরিশ কয়েক মিনিট কোন কথা কহিলেন না। অন্ধকার ঘর নিস্তব্ধ। অলক্ষ্য শাসনে মুহূর্ত্তগুলি দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল।

হরিশ মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, পারি না। সবাই যা বলে তা সত্য নয়। আমার শক্তি সামর্থ্য তুমিও জান না, ছেলেরাও না—পাড়াপড়শীরাও না। দু'খানা হাত—দু'খানা পা—আর চামড়ায় ঢাকা হাড় ক'খানা মজবুত থাকলেই সব পারা যায় না। আমি পারি না।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিলেন, কেন পারবে না, এই এতক্ষণ ধ'রে গল্প ক'রে সময় কাটালে—এই সময়ে তো—

পারি-না—পারি না। ওই গল্পের মধ্যেই আমার বিশ্রাম এটুকু তো কতবার বুঝিয়েছি। সব সময়ে কর্ত্তব্য করা যায়? না ভাল লাগে? ইস্কুলও আর বেশিদিন চলবে না।

বল কি—সংসার চলবে কিসে?

সংসারে চালাবার মালিক তুমি আমি নাকি! কর্ত্তব্য-ফাঁকি দিয়ে কাজ আমার সইবে না।

কি বলছো?

দিন দিন মন আমার গুটিয়ে আসছে কাজ থেকে। মনে হচ্ছে—বৃথাই গেল। পড়াতে বসলে ক্লাসে ঢুল আসে—মন চলে যায় আর এক দিকে। যে ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করতে চাই—তারা হয়ে যায় অন্য রকম।

দয়াময়ী বলিলেন, কেন, তোমার হাত দিয়ে কত উকিল—জজ—ব্যারিষ্টার—

হরিশ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, একজনও লক্ষ্মীছাড়া নয়—কেমন ?

দয়ামরী উষ্মাভরে কহিলেন, লক্ষ্মী না থাকলে গৌরব কিসের ?

ঠিক বলেছ—সবই বদলাচ্ছে—দেশ কাল পাত্র। কিন্তু ওতে মঙ্গল নেই। নিজেকে হারিয়ে ফেলার নেশা এ ভাল নয় গো।

কি ভাল কি মন্দ বুঝি না—ঘরে নিত্যি নেই এও তো ভাল নয় !

হরিশ উত্তেজিত হইলেন না, নিঃশব্দে দয়াময়ীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি দয়া—কিন্তু মনে রেখো আমার কষ্টও কম নয়।

দয়াময়ী কথা কহিলেন না। হু-হু করিয়া চোখের জল বহিলে কথা কওয়া যায় না।

৬

সেই চোখের জলের পিছল পথে তিরিশটি বছর পিছাইয়া গেলেন দয়াময়ী।

বৈশাখ মাস শেষ হইয়া জ্যৈষ্ঠ পড়িয়াছে। প্রতি মঙ্গলবারে জয়-মঙ্গলার ব্রতের পালুনি চলিতেছে—চলিতেছে দূর্ব্বা—কাঁঠাল পাতা—আম—তালশাঁস আর কলা সাজাইয়া ফলরূপিনী শক্তির উপাসনা। এমনই দিনে সম্বন্ধ আসিল বিবাহের। খুব বেশী দূরের গ্রাম নয়, একেবারে অজানা-অচেনা সংসারও নয়।

বাবা তবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলের কুলশীল কেমন? বিদ্যা কেমন?

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলে রূপবান তো?

হাঁ—কুলশীলে ত গ্রামে ছেলের জুড়ি নাই—বিদ্যাতেও সে অনন্য। গ্রামের ইস্কুলেই মাষ্টারী করে—সুনাম আছে অধ্যাপনায়। রূপও আছে ছেলের—কৌলীন্য বংশ সবই নিখুঁত —শুধু অভাব একটি জিনিসের। অর্থ নাই। তা বলিয়া ধার

কর্জ্জ নাই—বাস্তুভিটাও বাঁধা পড়ে নাই। অর্থভাগ্য কি শিবেরই ছিল ? গৌরীর মত সৌভাগ্যবতী কয়জন ! পার্থিব শিবপূজা করে কেন মেয়েরা ? উমার মত স্বামী লাভ করিবে বলিয়াই তো ? মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথায়—শিবের মহিমা কে না শুনিয়াছে ? বিবাহ যদি করিতেই হয়……দশ বছরের মেয়ের মনেও উমা-মহেশের পরিণয়-গাথার চিত্রখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ……কি কথা হয় শুনিবার জন্য অন্তরালে আড়ি পাতিয়া বসিল সে।

তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। স্বামী রূপবান গুণবান—বিদ্যার মান্যও তাঁর কম নহে। কিন্তু সংসার ? সেখানে শ্রী যে নাই তাহা নহে—তথাপি অভাবের ছায়া সেই শ্রীকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এমনটি তো পিতৃগৃহে ছিল না। অভাবের সঙ্গে নিত্যই মুখোমুখী পরিচয় লাভ হয়—নিত্য মনকে প্রবোধ দেয় বালিকা, এ আর কতদিন বা ! ভগবানের রাজত্বে—দুঃখ চিরদিন থাকে না—। সুখে দুঃখে মেশানো মানুষের জীবন—পালা করিয়াই এরা আসে যায়। ক্রমে দয়াময়ী বুঝিতে পারে এ সংসারে ইহাদের একজন অত্যন্ত আপনজন হইয়া অন্যকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এ যেন বর্ষা বাদলের দেশ—সূর্য্যোদয়ের আশ্বাস এখানে পোষণ করা চলে না। সে যাহা হউক—দুঃখের দিনও চলিতে চলিতে গা-সহা হইয়া যায়—ওরই মধ্যে সুখের

ছোট ছোট নীড় রচনা করিয়া ফেলে। কিন্তু ভাগ্য বিপরীত। স্বদেশিয়ানার হুজুগে পড়িয়া হরিশ দিন কয়েকের জন্য জেলে চলিয়া গেলেন।

দয়াময়ীর বাবা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি ভাবিনি যে এতদূর হবে—জামাই জেলে যাবেন! তুই আমার কাছে চ'—দয়া।

দয়াময়ী ততদিনে সংসার চিনিয়াছে—স্বামীকেও চিনিয়াছে। বলিল, উনি না এলে—কেমন ক'রে যাব বাবা!

জেল-খাটা লোকের সঙ্গে তুই ঘর করতে পারবি?

এ তো চুরি ডাকাতি ক'রে জেল খাটা নয়, বাবা।

বলিস কি—জেলে চোর ডাকাতের সঙ্গে থাকতে হয় না?

না বাবা, শুনেছি যারা স্বদেশী করে—তারা আলাদা থাকে।

তুই তো ভারি জানিস! আমাদের সমাজে জেল-ফেরত মানুষের সম্মান নেই।

এ জেল-ফেরতরা অন্য মানুষের চেয়ে সম্মান পায় শুনেছি। মৃদুস্বরে আপত্তি করে দয়াময়ী।

তবে সম্মান নিয়েই থাক,—আমার ঘরে জেল-ফেরতের জায়গা নেই।

রাগ ক'রো না—বাবা। দয়াময়ী অনুনয় করে।

মাত্র কয়েকদিন পরেই হরিশ ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, দয়া—ছাপমারা লোককে সবাই ঘৃণা করে—জান তো?

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

চাকরি যদি না জোটে?

সে ভগবান জানেন।

সহ্য করতে পারবে দুঃখ কষ্ট?

তুমি যদি পার—

দুঃখের সমুদ্র এবারে যেন অতলস্পর্শ হইয়া দেখা দিল। একে একে গায়ের যে ক'খানি অলঙ্কার ছিল গেল—ঘরের তৈজসপত্র গেল—অর্দ্ধাশন—অনশন এসবও চলিল। অবশেষে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বর্ত্তমান ইস্কুল মাষ্টারীতে স্থিত হইলেন হরিশ।

অর্দ্ধাশন বাঁচিল বটে—সংসারে সাচ্ছল্য আসিল না।

প্রতিবেশিনীরা কেহ কেহ উপদেশ দিল, এক কাজ কর ভাই—ঠাকুরপোকে আরও বেশী ক'রে ছেলে পড়াতে বল—তাহ'লে সংসারে সুসার হবে। ওই তো রাজু মাষ্টার—তোদের চেয়েও বড় সংসার—একরাশ লেণ্ডিগেণ্ডি—চালাচ্ছে না সংসার? সকাল বিকেল দু'বেলাতেই—পাল পাল ছেলে পড়িয়ে টাকার কাঁড়ি ঘরে তুলছে। ওর বোয়ের শুনছি—দু'হাতে তিনগাছি ক'রে বরফি চুড়ি গড়াতে দেয়া হয়েছে।

দয়াময়ী সুবিধামত হরিশকে বলিলেন, হাঁগা—তা আরও গোটা কতক ছাত্তর বেশী ক'রে বাড়াও না ?

তাহ'লে কি হবে ? হরিশ রহস্য করেন।

জানিনা কি হবে। আমারই না হয় আর দুটো হাত বেরুবে, হ'লো তো ?

হরিশ হাসিতে থাকেন অনেকক্ষণ ধরিয়া। দয়া রাগ করিয়া উঠিয়া যান। রাত্রিতে কথাটা আবার পাড়েন, সবাই যা করছে—তা তুমিও তো পার। তোমার বিদ্যে তো ওদের চেয়ে কম নয়।

হরিশ গম্ভীর মুখে বলেন, বিদ্যে-বুদ্ধি সবই আমার কম, না হ'লে তোমার গহনা নষ্ট হয়।

আমি যেন গহনার কথাই বলছি! দয়াময়ীর চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়ে। হরিশ অপ্রতিভ হইয়া সান্ত্বনা দিতে থাকেন, আর—এই সামান্য কথায় কাঁদ কেন ? কান্নার কথাটা কি হ'লো ?

সে তুমি বুঝবে না। মেয়েমানুষের কোন্ গহনা সব চেয়ে বড় সে তোমরা বুঝতে পার না—বুঝতেও চাও না।

জানি দয়া। জানি ব'লেই—সংসারের দুঃখ কষ্ট আমায় একটুও দমাতে পারে না। তুমি যদি বোঝা হতে—আমি এতদিনে কোথায় তলিয়ে যেতাম! দয়ার কাঁধে সস্নেহ চাপ দিয়া হরিশ হাসিবার চেষ্টা করেন।

এক চোখের জল—আর এক চোখের জলকে টানিয়া বাহির করে। পরস্পরের বাহুলগ্ন হইয়া দুইজনেই চোখের জল ফেলিয়া লঘু হইলেন। ত্রিশ বৎসরের পারের এই ক্ষণটি—মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসে—স্থানকালের ব্যবধান মুছিয়া যায়—দয়াময়ী নিজেকে হারাইয়া ফেলেন।...অভাবের সংসারে কোন অভাব-টাই দয়াময়ীর বুকে বিশেষভাবে বাজে না—হরিশের পানে চাহিয়া কোন অলঙ্কারের কথাও তাঁর মনে উঠে না।

৭

হঠাৎ এমন হইবে হরিশ ভাবেন নাই। আর ভাবিলেই তো প্রতিকার করা সম্ভব নয়। যাহাদের অর্থ আছে এবং সেই সঙ্গে আছে দূরদৃষ্টি—সময় থাকিতে তাহারা সাবধান হইয়াছে।

শূন্য থলি হাতে হরিশ বাজারের রাস্তা দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন। চাল মহার্ঘ্য ছিল, দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পরশু সন্ধ্যাবেলায় যাহা মিলিয়াছে আজ সকালে তাহার কণামাত্রও কোন দোকানে নাই। নানান রকমের ডাল মশলা—বেশম প্রভৃতি দোকানে সাজানো আছে; শোভাবর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে সেগুলি উপবাসী মানুষকে বিদ্রূপ করিতেছে।

পাশ দিয়া গোবর্দ্ধন মোদক যাইতেছিল—হরিশকে দেখিয়া দু'টি হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, পেন্নাম মাষ্টার মশায়। থলি হাতে ক'রে বাজারে চলেছেন বুঝি?

নারে—চাল আনতে গিয়েছিলাম—

চাল! চাল পাবেন কোথায়? সারা গাঁ ঘুরলে এক ছটাক মিলোতে পারেন তো ঢের!

এই পরশুও তো নিয়েছিলাম—যদুর দোকান থেকে—

কালকের কাগজে দেখেননি—মাষ্টার মশায়। কোম্পানী পঁচিশ টাকা দর বেঁধে দিয়েছে—চালও রাতারাতি লোপাট।

কোথায় গেল এত চাল ?

মা-লক্ষ্মী কখন আসেন—আর কোন্ দিক দিয়ে যান কেউ সন্ধান রাখতে পারে ? হরিশের নিকটে সরিয়া আসিয়া চোখ টিপিয়া অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, আছে—যদুর দোকানেই আছে। কিন্তু আপনি গেলে পাবেন না।

কেন ?

যদু আপনার ছাত্তর না ? চক্ষুলজ্জা ব'লে একটি জিনিস আছে তো।

হরিশ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া গোবর্দ্ধন তাঁহার হাত হইতে থলিটি লইয়া কহিল, দিন —পয়সা দিন। কত চাল চাই ? পাঁচ সের। তা দু'টাকায় তো পাঁচ সের মিলবে না। চোরা বাজারে বত্রিশে বিকোচ্ছে কিনা।

চোরা বাজার কি ?

এসে বলছি। এতকাল মাষ্টারী ক'রে এসেছেন ঠাকুর—সারা পৃথিবীর খবর রেখেছেন আর দেশের খবর রাখেন নি।

গোবর্দ্ধন দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

হরিশের বিশ্বাস হইল না—গোবর্দ্ধন চাল আনিতে পারিবে। যদু কখনও তাঁহার কাছে মিথ্যা বলে নাই। চাল থাকিলে কি সামান্য পাঁচ সের চালের জন্য সে কঠিন কঠিন শপথগুলি অমন দ্রুত আর অত অনায়াসে করিতে পারিত!

চাল পাইয়া হরিশের আনন্দ হইল না, শুষ্ক মুখ তুলিয়া উপরের পানে একবার চাহিলেন। শরতের আকাশের রং ঘন নীল। কিন্তু তার পিছনে পাটল বর্ণের একখানি বড় মেঘ দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। মুখ নামাইয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। যদু তাঁহার ছাত্র, যদু সামান্য চালের জন্য মিথ্যা কথা বলিল! যদু? আপন মনে মাথা নাড়িয়া জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন। হাতের বোঝাটা অত্যন্ত ভারি বোধ হইতেছে।

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল কখন?

চালের পুঁটুলিটি রোয়াকের উপর নামাইয়া হরিশ বলিলেন, আমার চাল নিয়ো না, শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

দয়ামযী বলিলেন, রান্না আমার হ'য়ে গেছে, শরীর ভাল না থাকে চান ক'রো না, দুটি খেয়ে যাও।

হরিশ বিস্মিতকণ্ঠে বলিলেন, কাল রাত্তিরে বললে না চাল নেই?

তুমিও বেরিয়ে গেলে শান্তি দি' এলেন বেড়াতে। সব শুনে বললেন, ওমা, কখন চাল আসবে কখন রান্না হবে তাই খেয়ে মানুষ ইস্কুল করতে পারে। দু'কাঠা চাল এনে দিলেন।

দু'কাঠা! হরিশ রোয়াকের উপরে বসিয়া পড়িলেন।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। দু'কাঠা চালই তো আনতে গেলে।

পাইনি—ত্রিশ বত্রিশ চালের দাম। যা পেলাম তাতে আধপেটা চলবে।

দয়াময়ী নিরুৎসাহিত হইলেন না। থলিটি হাতে উঠাইয়া কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, নেয়ে নাও। আজই তো শান্তি দিদি চাল চাইছেন না।

কাল চাইলেও দেয়া যাবে না, পরশুও না। হয়তো কোন দিনই না, চাল নাকি আর পাওয়া যাবে না।

না, ভগবানের রাজত্বে মানুষ না খেয়ে মরবে! ওঠ ওঠ।

কথাটা বিদ্যুৎ চমকের মত মনের অন্ধকার কোণে দাগ কাটিয়া দিল। ভগবানের রাজত্বে মানুষ না খাইয়া মরে না! রাজত্বটা ভগবানের এ বিশ্বাস মানুষের আছে তো? সারা দুনিয়াটি তো ভগবানের, তবু এক জাতি অন্য জাতিকে প্রাণপণে অস্বীকার করিতেছে। এক জাতি কৌলীন্য-মর্য্যাদায় অন্য জাতির উপরে প্রভুত্বের ফতোয়া জারি করিতেছে কোন্ শুভ

বুদ্ধিতে ? জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান, বিদ্যাহীনকে সংস্কৃতি দান, অন্ন-বঞ্চিতকে জীবন দান এবং মূঢ়কে ভালবাসা এ বুঝি ঈশ্বরের বিধান নয়? এই সব মহৎ দানের স্বীকৃতিতে মানুষ বুঝি নিঃস্ব হইয়া যায়? স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের আজ এ দশা কেন? ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রদেশের বাহিরে ছিল এই ভারতবর্ষ? এর সভ্যতা, আর্য্যামী, ব্রাহ্মণ্য সবই শ্বেত জাতির ললাটে গৌরব-টিকা পরাইয়াছিল কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে ?

হরিশ আপন মনে হাসিলেন। ঈশ্বরের রাজত্বে মানুষ মরে না একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষে ঈশ্বর নাই। এখানকার দুঃখের স্রষ্টা মানুষ। এখানে না খাইয়া মরাটাও তাই স্বাভাবিক।

৮

ইস্কুলে সেদিন কেহই মনোযোগ দিয়া পড়াইতে পারিলেন না। আপিস ঘরে ভাবী মন্বন্তর লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল।

হেড মাষ্টার বলিলেন, এমন অবস্থা বেশিদিন থাকতে পারে না, থাকবে না। সরকারের টনক নড়েছে।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, টনক নড়লে সিলোন থেকে ব্যারণ জয়-তিলক এসে লাখ লাখ টন চাল কনট্রাক্ট ক'রে যায়!

হেড পণ্ডিত বলিলেন, সেখানে শুনি পঞ্চাশ টাকা মণ চালের। বাংলার যা উদ্বৃত্ত চাল আছে—

সুশীল টেবিলে প্রচণ্ড একটা থাবা বসাইয়া দিয়া কহিল, উদ্বৃত্ত নেই। আমাদের জীবন কি আর জীবন! টাকাটাই ওদের আসল লক্ষ্য। আমরাও তাই উদ্বৃত্ত।

হরিশ বিস্মিত হইলেন। প্রবীন মাষ্টারদের সম্মুখে গলা ফাটাইয়া টেবিল চাপড়াইয়া তর্ক করা ধৃষ্টতারই নামান্তর। সুশীল আরও যাহা অনর্গল ভাষায় বলিয়া গেল তাহাও ঔদ্ধত্যের নামান্তর। তবু সুশীলের এই অবিনয় কাহারও দৃষ্টিকে

বা শ্রুতিকে আঘাত করিতেছে না, কোথায় জমিয়া আছে গ্লানি। অশোভন উষ্মার ধূমে ঘরের বাতাস এমন ভারি হইয়াছে যে নিশ্বাস টানা দায়, তবু সুশীলের কথা সবাই আগ্রহভরে শুনিতেছেন। হরিশের বিস্ময় এইজন্য যে, সে কথার পিছনে যে প্রচ্ছন্ন জ্বালা তা বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই তীব্রতর হইতেছে। প্রতিকার হয়তো নাই তবু প্রতিবাদই বা করে কয়জন? নীতিবাদকে ঘৃণা করে সুশীল, করুক। তার অন্তরে যে আগুন কথার উত্তাপে অনাবৃত হইয়া গেল তাহাকে অশ্রদ্ধা করা কঠিন। শুধু কঠিন নয় পাপ।

হরিশ মনে মনে উচ্চারণ করিলেন, বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্ব্বরী দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।

হেড পণ্ডিত বলিলেন, বাবা, যা হবার অনেককাল থেকে হয়েছে। এখন উপায় কি?

সুশীল বলিল, উপায় আছে, পারবেন আপনারা?

থার্ড মাষ্টার বলিলেন, আমরা না পারি তোমরাও তো পার।

না পারি না। টেবিল চাপড়াইয়া সুশীল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। উমিচাঁদ জগৎশেঠ মীরজাফরদের আমরা জানি, তারা থাকতে কোন কিছু হবার নয়।

হেড পণ্ডিত ব্যঙ্গভরে কহিলেন, বেশ তো, চেন যখন ধ'রে ধ'রে তাদের শাস্তি দাও না!

দেখুন, শস্তা ঠাট্টারও সময় আছে। যা বাসর ঘরে মানায় তা ইস্কুল ঘরে শোভা পায় না। সুশীল গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

হেড পণ্ডিত সহসা রুখিয়া উঠিলেন, লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ার, ভদ্রভাবে কথা কইতেও শেখনি!

সুশীলও সমান তেজে জবাব দিল, Shut up you old fossil.

হৈ হৈ হট্টগোলে টিফিন পিরিয়ডেই ইস্কুল ভাঙ্গিয়া গেল।

সুশীল শাসাইয়া গেল—হেড পণ্ডিত মহাশয় ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে সে ইস্কুলে ধর্ম্মঘট করিবে।

হেড মাষ্টার বলিলেন, পণ্ডিত মহাশয়ের জানোয়ার বলাটা উচিত হয় নি।

হরিশ প্রতিবাদ করিলেন, মাষ্টারদের লঘুগুরু জ্ঞান না থাকলে ছাত্রদের কাছে কি আশা করেন আপনি? এটা শিক্ষালয়, আড্ডা ঘরের মত কথা বা চ্যাংড়ামি শোভা পায় না।

হেড পণ্ডিত অভিমানক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, আপনি যদি মনে করেন সুশীলের শাসানিতে ইস্কুলের ক্ষতি হবে তাহ'লে আমার রেজিগনেশন নিন।

না না, তাতো বলিনি। মানে ওরা হচ্ছে পার্টির লোক। একটা কিছু ছুতো পেলেই আন্দোলন ক'রে থাকে।

হরিশ বলিলেন, স্কুল কেন ভয় করবে পার্টিকে ?

হেড মাষ্টার হাসিলেন, পার্টি কোথায় নেই ? জেলার হাকিম হচ্ছেন স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য প্রত্যেক কমিটি মেম্বারের মন রেখে কি চলিনে ? সেক্রেটারিকে কি সন্তুষ্ট রাখতে হয় না ?

হরিশ সে কথায় কান না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, ওদের পার্টিটা কিসের ? স্বদেশী কিছু ?

হেড মাষ্টার বলিলেন, পোষাকটা বাইরের, দেহটা স্বদেশী ব'লেই মনে হয়। ওরা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে।

ফ্যাসীবাদ কি সাম্রাজ্যবাদের আর একটা শাখা নয় ? সেকেণ্ড মাষ্টার প্রশ্ন করিলেন।

হেডমাষ্টার বলিলেন, তা জানি না। তবে ওদের মটো হচ্ছে যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

সকলে হাসিয়া উঠাতে আবহাওয়া খানিকটা তরল হইল।

হরিশ কহিলেন, পণ্ডিত মশাই ক্ষমা চাইবেন না। চাইতে পারেন না। স্বদেশী আন্দোলনের চেহারা আমরাও বেশ জানি। সে এমন উদ্ধত কোন কালে নয়, নেতাদের ওপর অশ্রদ্ধাও পোষণ করতো না। সরকারকে আশ্রয় ক'রে সরকারকে খর্ব্ব করা এ যে ভাঙ্গা ঘরের ফাটলে বট অশ্বত্থের চারা। ওরা ধ্বংস করতে চায়—

আপনাদের অগ্নিযুগের সন্ত্রাসবাদও তো—

হরিশের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, আত্মঘাতী নীতিতে অগ্নিযুগের প্রতিষ্ঠা হয় নি—সার। সে মন্ত্র বিফল হ'লো ব'লে সে মন্ত্রের প্রাণশক্তি ছিল না এ বিশ্বাস আজও করিনে।

যাক, ইস্কুলে এসব আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভুল সকলের হয় একথা স্বীকার করেন তো ?

করি। কিন্তু ভুলের সঙ্গে বর্ব্বরতা সহ্য করতে পারি না। যারা সমাজ ভাঙ্গতে চায় তারা সমাজের মূল্য বোঝে না।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, হাঁ—য়ুরোপে ব্যক্তিগত প্রাধান্য—আর এখানে সমাজগত। দু'-মহাদেশের সমস্যা এক রকমের হ'লেও সমাধান এক রকমের নয়।

না—না—এসব আলোচনা আর নয়। হেডমাষ্টার মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন।

৯

পথ চলিতে চলিতে মাধব বলিলেন, চাল পাচ্ছ তো হরিশ?

হরিশ অন্যমনস্কে নববিপ্লবের কথা চিন্তা করিতেছিলেন।

মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।

পাচ্ছ! অথচ সারা সকাল চেষ্টা ক'রেও একদানা জোটাতে পারি নি। কোথায় পেলে?

অ্যাঁ! হরিশ বাস্তব জগতে ফিরিলেন। আচ্ছা মাধব—তুমি বেনিটো মুসোলিনীর জীবনী পড়েছ? ফ্যাসিবাদের জন্ম ইটালীতেই না?

শুনি তো। ফ্যাসিবাদের বুলি ছাড়—গান্ধীবাদও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। উপস্থিত চাল কিসে পাওয়া যায়—

বাঁচাতে কেউ পারে না মাধব, চেষ্টা ক'রে নিজেকে বাঁচতে হয়। দোষটা গান্ধীবাদের কিসে?

আরে—ওসব কথার কথা—তাই বললাম। নইলে গরীব ইস্কুল মাষ্টার কোন বাদেরই ধার ধারি নে।

হরিশ গম্ভীরমুখে বলিলেন, যার ধার ধারো না তার নিন্দেও ক'রো না।

মাধব বলিলেন, তুমিও একদিন আগষ্ট মুভ্‌মেণ্টে যোগ দেবে বলেছিলে না?

মুভ্‌মেণ্ট আর জম্মালো কই! সরকারের চণ্ডনীতির প্রতাপটা দেখলে তো?

মাধব হাসিয়া বলিলেন, তা বটে, কতকগুলি বিভ্রান্ত লোক সাময়িক উত্তেজনায় যা করে বসলেন তা বিপ্লবের সুস্থ রূপ নয়।

হরিশের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, মুহূর্ত্তের উত্তেজনা! তুমি জাননা মাধব—সিপাহী বিদ্রোহের আগুন—অনুকূল আবহাওয়ায় আর একবার জ্ব'লে উঠেছিল শুধু। বিভ্রান্তি নয় চাপা আগুন।

মাধব বলিলেন, ঠিক কথা, তোমরাও তো অহিংসায় বিশ্বাস রাখ না।

তা ব'লে গান্ধীকে অশ্রদ্ধা করিনে। ওঁর সব নীতি বা কর্ম্মপন্থা মানতে পারি নে—একটি ধ্রুব লক্ষ্যের জন্য ওঁকে শ্রদ্ধা করি। বলিতে বলিতে হরিশ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, জান মাধব—যার ওপর ভিৎ গেড়ে ইমারৎ পাকাভাবে উঠতে পারে—সেইটে উনি জেনেছেন। সত্য—প্রকৃত সত্যই হ'লো ওঁর অহিংসার ভিত্তি। এই সত্য যার জীবনে প্রকাশিত হয়—

মাধব বলিলেন, সত্য ব'লে গান্ধী বাঁচতে পারেন—কারণ তাঁর প্রতিষ্ঠা অনন্যসাধারণ—তোমার আমার বাঁচা সম্ভব নয়।

মাধব!

হরিশের আর্ত্তধ্বনিতে মাধবও লজ্জাবোধ করিলেন। মুখ নামাইয়া বলিলেন, কি করবো ভাই—বাঁচতে হবে তো। এইমাত্র একজন সন্ধান দিলে—যদুর কাছে যাচ্ছি। তবে মিথ্যে না বললে চাল পাওয়া যাবে না।

হরিশ প্রশ্ন-উন্মুখ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিলেন।

ঢোক গিলিয়া মাধব বলিলেন, সর্ত্ত এই, পথে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে পঁচিশে নিলাম—যদিও তার দাম পঁয়ত্রিশ।

হরিশ মাথা নীচু করিলেন। এই অসত্যের অভিনয় তিনিও তো করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের মারফৎ যে জিনিস আসিয়াছে—তাহা কোন ন্যায় বা সত্যের পরিপোষক নহে। ভাগ্যে কেহ পথের মাঝে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার সত্যনিষ্ঠাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

আর কোন কথা হইল না—হরিশ সোজা বাড়ি আসিলেন। রোয়াকে উঠিতেই সাত বৎসরের উলঙ্গ শিশু দেবু আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

অস্তসূর্য্যের কোমল কিরণ-লেখা দেবুর সর্ব্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। খাওয়ার ভোগ নাই—তবু উজ্জ্বল গৌরকান্তি

ছেলেটির। সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই সে স্নেহের অবশিষ্ট যাহা কিছুও লুটিয়া লইয়াছে। ভাবী মানুষের—মহৎ মানুষের বিপুল সম্ভাবনা ওদের নিষ্পাপ সরল দৃষ্টিতে? ওরা শিশু নয়—দেবতা। ছেলেটিকে কোলের কাছে টানিয়া হরিশের সমস্ত চিন্তার জ্বালা জুড়াইয়া গেল।

আজ কে এসেছেন জান বাবা?

কেরে?

দিদি—জামাইবাবু।

কখন এলেন রে?

এই তো—তুমি আসার একটু আগে।

আনন্দের কথা—উমা আসিয়াছে। কিন্তু আনন্দকে পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। কিসের বেদনা—কিসের অভাব কোথায় পীড়া দিতেছে।

গিরিশ ও উমা প্রণাম করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া হরিশ তাহাদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়ে মায়ের কাছে গিয়া বসিলে গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি নাকি কলকাতায় কি ব্যাঙ্কের চাকরি নিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাঙ্কটা ভাল, দেশী নয়।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিশ বলিলেন, বিলিতী ব্যাঙ্ক হ'লেই বুঝি খুব ভাল হয়।

আজ্ঞে ওদের সততা—সাধুতা—

হরিশ বাধা দিলেন, পেট ভরা থাকলে গরিবের ওপর করুণা করা সহজ। সেটা কিন্তু প্রকৃত দয়া নয়, সততা সাধুতাও নয়।

গিরিশ সবিস্ময়ে কহিল, আমি বলছি—

জানি মেনে নিলাম—ওইটিই প্রকৃত দয়া, সততা বা সাধুতা, কিন্তু দয়া যাঁরা নেন—তাঁদের মাথা উঁচু রাখা কঠিন নয় কি ?

গিরিশ কথা কহিল না—শ্বশুর কোন কারণে উত্তেজিত হইয়াছেন এটুকু সে বুঝিয়াছে।

হরিশ কহিলেন, চাকরি না করলে যখন উপায় নেই, তখন চাকরি করতেই হবে। ওর থেকে দাস মনোভাবটা যত বাদ দেবে ততই সুস্থ থাকবে।

খানিক থামিয়া প্রশ্ন করিলেন, কলকাতায় নাকি ডেষ্টি-ট্যুটদের জন্য খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে ? অনেক লোক এসেছে বুঝি ?

তা লাখ খানেক হবে। অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুলেছে —তবু সকলের ভাগ্যে এক হাতা খিচুড়িও জুটছে না।

হরিশ বিবর্ণ মুখে কহিলেন, বল কি—জাতটাকে ভিক্ষুক বানিয়ে ছাড়লে! যারা খেতে পায় না তারা কি করছে! চুরি করছে ?

চুরি করবার ক্ষমতা কোথায় ? পাতলা চামড়া-ঢাকা ক'খানা হাড় ধুক্ ধুক্ করছে।

আহা ! প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া হরিশ মৌন হইয়া রহিলেন।

খাবারের দোকানের সামনে থালা ভর্ত্তি খাবারের পানে চেয়ে কত লোক যে মরে যাচ্ছে !

হরিশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন।

রাত্রিতে জামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের গ্রামেরও তো ওই অবস্থা বলছ—বেয়াই বেয়ান কি করছেন ?

বাবা তাঁর মামার বাড়ি গেলেন। সেখানে কিছু জমি আর দাদা-মশায়ের বাড়ি আমরা পেয়েছি কিনা।

তবে উমা এখানে থাকুক।

জামাতা নীরবে মাথা নাড়িল।

আহারাদির পর দয়াময়ীকে বলিলেন, কাল সকালে—পাঁচটা টাকা দিয়ো আমায়—চাল কিনে রাখব।

দয়াময়ী বলিলেন, পনেরো দিনের মত চাল ঘরে আছে। ওই দিয়ে উমাকে একখানি লাল পাড় শাড়ি কিনে দিও বরঞ্চ।

পনেরো দিনের চাল এলো কোথা থেকে ?

ভগবান সহায় থাকলে ভাবনা কিসের। জামাই তাঁদের দেশ ছেড়ে দিয়েছেন। বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে অনেক জিনিস গেল তো—উমাকেও তার থেকে কিছু দিয়েছেন।

শুধু চাল নয়—আরও—

চাল—ডাল—আলু—আর গোটা দুই বিলিতী কুমড়ো।

হরিশ তাড়াতাড়ি কহিলেন, তরকারী খাওয়া অভ্যাস আমাদের নেই—অত কি হবে।

ছেলেরা খাবে—আমি খাব। দয়াময়ী হাসিলেন।

হেসো না—সত্যি বলছি—ও চালের ভাত আমি খেতে পারব না। কোথায় মেয়েকে খাওয়াবো—

পাগলামী ক'রো না। বাপেরই কর্ত্তব্য আছে, মেয়ের নেই বুঝি ?

হরিশ আর প্রতিবাদ করিলেন না। প্রতিবাদ করিবার আছেই বা কি। এই স্নেহের প্রকাশে অসম্মান নাই—তথাপি ক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা—আহত মর্য্যাদা মনকে খোঁচা দিতেছে বার বার।

১০

সকালে হাত মুখ ধুইতেছেন—একজন ছোকরা সাইকেল হইতে নামিয়া হরিশের হাতে একখানি পত্র দিল। মুখে বলিল, সেক্রেটারি বাবু আপনাকে ডাকছেন—এখ্খুনি আস্থন।

স্নান—সন্ধ্যা আহ্নিক না সারিয়াই হরিশ বাহির হইয়া গেলেন।

প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ির সামনের দিকে বৈঠকখানা। ঘরের সৌষ্ঠব নাই—সজ্জাও নাই। খাটো তক্তাপোষের উপর সতরঞ্জি—তার উপর আধময়লা চাদর পাতা ও গোটা-কতক তাকিয়া পড়িয়া আছে। আট দশখানি তক্তাপোষে কুড়ি হাত লম্বা ঘরের প্রায় সবটুকুই ভর্ত্তি, বাকি তিন চার হাতের মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের টেবিল, খানছুই পালিশ-হীন চেয়ার ও একটা টুল আছে। আসবাবের মধ্যে একটা সেকালের দেওয়াল ঘড়ি ও একখানি রাজারাণীর ছবি আছে। প্রাচীন বনিয়াদি বাড়ি—পয়সার অভাব নহে—আলস্য বশতঃই বহুদিন সংস্কৃত হয় নাই। কর্ত্তারা—কলিকাতায় বড় বাড়ি

কিনিয়াছেন। প্রকাণ্ড আড়ৎ আছে বড়বাজারে। অনেক জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায়ে—লাখ লাখ টাকার মূলধন খাটিতেছে। পালেপার্ব্বণে বাড়ি আসেন, দেশের প্রতি প্রীতি-বশতঃ নহে—কখনো খেয়ালের বশে, কখনো বা প্রাণের দায়ে। কলিকাতায় বোমা পড়িলে যেমন আসিয়াছিলেন। ইস্কুলকে যে খুব সাহায্য করেন—তা নয়। লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্রদের বাহন না করিলে প্রতিষ্ঠানের রথ ভাল চলে না বলিয়াই এই ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা দেশের পাঁচ জনেই করিয়াছেন। সরকারী রায় বাহাদুর খেতাব আছে, রাজপুরুষেরা অনেক অনেক ব্যাপার উপলক্ষে অতিথিও হইয়াছেন। অতিথিতোষণে তাঁদের খ্যাতিটা গ্রাম তথা জিলায় প্রসারিত।

মহিমবাবু গড়গড়া টানিতেছিলেন। একটি তাকিয়া বাম হাঁটুর নীচে—আর একটিতে তিনি ঠেস দিয়াছেন। দুইটিই প্রচুর তুলা ঠাসা সত্ত্বেও পুরু গদির আকার ধারণ করিয়াছে। হরিশের প্রবেশ মুহূর্ত্তটির একটু আগে কি একটা কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে—তাহার জের সমবেত লোকগুলির হাসির গমকে ও মহিমবাবুর স্তবক-বদ্ধ ভুঁড়ি ও মেদ-মসৃণ দেহ-তরঙ্গে তখনও প্রকটিত।

এস মাষ্টার—ব'স। প্রায় শুইয়া-পড়া দেহটাকে অল্প নাড়িয়া মহিমবাবু অভ্যর্থনা করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া হরিশ দেখেন—গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা অর্থাৎ ইস্কুল কমিটির সভ্যেরা এবং জন দুই-তিন মাষ্টারও সেখানে রহিয়াছেন। তন্মধ্যে হেড পণ্ডিত মহাশয়ও আছেন।

হরিশ আসন গ্রহণ করিলে হেড পণ্ডিত মহাশয় আরম্ভ করিলেন, হরিশকে জিজ্ঞাসা করুন—মিছে কথা বলবার লোক ও নয়। মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে ইস্কুলে কাজ করা আজকাল কত কঠিন।

মহিমবাবু ভনিতা না করিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিলেন, সুশীল মাষ্টার—পণ্ডিত মশায়কে অপমান করেছে, ইংরেজীতে যা তা ব'লে গাল দিয়েছে শুনলাম। আর শাসিয়েছে ইস্কুল বন্ধ ক'রে দেবে ?

হরিশ বিস্মিত হইলেন—ক্ষুব্ধ হইলেন। নিজের সম্মানকে পণ্ডিত মশায় এতটা লঘু করিতেছেন কেন ? ইস্কুলের ব্যাপার সেক্রেটারির বাড়ি পর্য্যন্ত টানিয়া আনার হীনতা কি উনি বুঝিতে পারেন না ! সুশীলের দোষ আছে সত্য—কিন্তু কাপুরুষের মত সেই দোষ তাহার অলক্ষ্যে উদ্ঘাটন করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার আয়োজন—তিনি সমর্থন করিতে পারেন না। মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সে এমন কিছু নয়। বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, তাই নিয়ে তর্ক হ'লো—

হেড পণ্ডিত তীব্র স্বরে বলিলেন, পরের গায়ে লাগলে তেমন বাজে না—জানি, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বল তো হরিশ—

হরিশ ধীর কণ্ঠে বলিলেন, মাপ চাইলে যে ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায়—তা নিয়ে বেশি ঘোঁট করা ভাল নয়—পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত ক্রুদ্ধ স্বরে কি বলিতে যাইতেছিলেন মহিমবাবু তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া অনেকখানি সোজা হইয়া বসিয়া তাকিয়াটিকে কোলের কাছে সাপটিয়া ধরিলেন। আমি সেক্রেটারি—ইস্কুল সম্বন্ধে সব ব্যাপার শোনা উচিত আমার। নয় কি?

সকলেই শিরশ্চালনে উৎসাহ জ্ঞাপন করিলেন।

মহিমবাবু বলিতে লাগিলেন, সুশীলের পার্টিকে আমি জানি। কাল সকালে ক'জন চ্যাংড়া ছোঁড়া এসেছিল—অবশ্য সুশীল আসেনি। বলে আপনারা হোর্ড করছেন জিনিস। দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরছে—আপনারা ব্যাঙ্কের ব্যালান্স বাড়িয়েই চলেছেন। আরে তোরা কি বুঝিস ব্যবসার জল কোন্ ঘাটে এসে থিতোয়? তোরা কতকগুলো শ্লোগান আউড়ে করবি চীৎকার, লোককে ক্ষ্যাপাবি। তারা মরবে সেপাইয়ের গুলিতে, তোরা যাবি জেলে। ব্যস্! এই পর্য্যন্ত তো তোদের দৌড়!

কয়েকজন হাসিয়া উঠিলেন।

মহিমবাবু বলিলেন, ব্যবসা আমি একা করছি? জগৎ জুড়ে দেখগে কালো বাজারের ফলাও কারবার। ইংরেজ করে না, জার্ম্মাণ করে না, না এ্যামেরিকানরা বাদ যায়! সব পাখীই মাছ খায়—বদনাম শুধু মাছরাঙার।

হাসির সমর্থনে তিনি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, ছোঁড়াগুলো বলে—আপনার মজুত চাল ডাল যা আছে ন্যায্য দামে ছাড়ুন, গাঁয়ের লোক খেয়ে বাঁচুক। আরে গাঁয়ের লোক খেয়ে বাঁচে তা কি অসাধ আমার। কিন্তু ন্যায্য দামটা দেবে কে? কোম্পানী দর বাঁধলে পঁচিশ। চাষার কাছ থেকে কিনবে পঁচিশে, খদ্দেরকে দেবে পঁচিশে। মাঝখানের দালালি, গাড়ি ভাড়া, গুদোম ভাড়া গাঁটের পয়সা দিয়ে—কেমন লাভের ব্যবসা বলুন তো!

এবারও অনেকে হাসিলেন, কিন্তু ধ্বনিটা তত উচ্চে উঠিল না।

মহিমবাবু হাসির আওয়াজে হাওয়াটা আঁচ করিয়া মুখে দুঃখের ভাব টানিয়া কহিলেন, কথায় বলে যা দান করবে ডানহাতে তা যেন বাঁহাত না জানতে পারে। সেই হ'লো গিয়ে আসল দান। তোদের মত কতকগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়ার ভয়ে গুদোমের চাবি খুলে দানছত্তর করি আর কি!

টেলিগ্রাম ক'রে চারজন নেপালী আনালাম আজ কলকাতা থেকে।

স্তব্ধ-গাম্ভীর্য্যে ঘরটা থম থম করিতে লাগিল।

হরিশ হঠাৎ কহিলেন, আজ উঠি তাহ'লে।

একটু দাঁড়াও মাষ্টার। দু'খানা রিপোর্ট লিখে রেখেছি, একখানি পাঠাবো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে আর একখানি পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে। তোমরা সব সাক্ষী থাকবে।

হরিশ কাতর কণ্ঠে কহিলেন, দেখুন সামান্য ব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভাল। ছেলেরা কোথায় কি বললে তা নিয়ে মাথা ঘামানো আপনার মত বিজ্ঞের ভাল দেখায় না।

তুমি জান না মাষ্টার, একটু ধোঁয়ার নীচেয় যে অল্প আগুন থাকে তা একখানি গ্রামের ক্ষতি করতে পারে।

তাহোক, আপনি ওদের মাপ করুন। ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

মহিমবাবু অল্প হাসিয়া বলিলেন, আপনি কি বলেন পণ্ডিত মশায়? ব্যাপারটা চেপে যাব?

পুলিশ—ম্যাজিষ্ট্রেট এসব হাঙ্গামা পণ্ডিতেরও ভাল লাগিতেছিল না। খানিকটা উৎসাহের সঙ্গেই বলিলেন, এবারটা না হয় মাপ করা যাক।

আচ্ছা—কিন্তু আপনার কাছে লিখে অ্যাপলজি চাইতে হবে। স্কুলের ডিসিপ্লিন যাতে নষ্ট না হয়—

হরিশ বলিলেন, নিশ্চয়।

অন্যান্য সকলে ঘাড় নাড়িয়া হরিশ মাষ্টারকে সমর্থন করিলেন।

১১

একটু দ্রুতপদেই বাড়ি ফিরিতেছিলেন। এখন অনেক পর্ব্ব বাকি। স্নান—আহ্নিক—আহার।

নমস্কার—মাষ্টার মশায়। একটি যুবক হেঁট হইয়া হরিশের পায়ের ধুলা লইল।

সে সোজা হইলে হরিশ কহিলেন, আমি তো তোমায় চিনতে পারলাম না—বাবা।

আমি নীতিশ। মজুমদার বাড়ির ভাগ্নে—

ওহো—তুমি নীতিশ? ভালো তো বাবা? কি করছো আজকাল? মেডিক্যাল লাইনে—

আজ্ঞে গেলবার পাস ক'রে বেরিয়েছি।

বেশ, বেশ। তোমার বাবা—মা—ভাইবোনেরা সব ভাল আছেন?

আজ্ঞে হাঁ। আজকাল প্র্যাকটিস করছি বালিগঞ্জ অঞ্চলে। একখানা বাড়িও কিনলাম।

বেশ বেশ। তা এক বছরে বেশ উপার্জ্জন করেছ—শুনে খুসি হলাম।

ছেলেটি বিনীত-হাস্যে বলিল, আজ্ঞে যুদ্ধ না বাধলে বাড়ি করার সুযোগ ঘটতো না। প্রথম পাস দিয়ে বেরিয়েই দেখলাম —কুইনিনের বাজারে টান ধরেছে। যেখানে যা ছিল—মায় মার গহনা পর্য্যন্ত—বাঁধা দিয়ে কুইনিন আর কতকগুলো ইন্‌জেক্‌সনের ওষুধ কিনলাম।

বটে—বটে। তা বেশ—, বলিতে বলিতে হরিশের গলায় কথা আটকাইয়া গেল। এইমাত্র মহিমবাবুর বৈঠকখানায় যে কথা শুনিলেন—নীতিশও কি সবিনয়ে তাহাই পুনরুক্তি করিতেছে? ওকি কালো বাজারের দৌলতে বালিগঞ্জে প্রাসাদ তুলিতে পারিয়াছে? ন্যায্য দামে কিনিয়া ন্যায্য দামে বেচিলে—

হরিশ পাশ কাটাইবার উদ্যোগ করিলেন। আজ্ঞে বিকেলে আপনার কাছে একবার যাব।

বেশ—বেশ। হরিশ পা চালাইয়া দিলেন। সেই নীতিশ— অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া মামার বাড়ি খাইয়া মানুষ। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ—কমনীয় দেহকান্তি, সত্যভাষণে সে ছিল হরিশের সব চেয়ে প্রিয়তম ছাত্র। একদিন তাহাকে জগতের মনীষীদের সততা, সাধুতা ও জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস কি উৎসাহেই না

শুনাইয়াছেন হরিশ। ওর প্রাণে স্বদেশ-প্রেম ছিল। বন্দে মাতরম্ গান—ওর কণ্ঠে শুনিলে মাটিকে মা বলিয়া মাথা আপনি হেঁট হইয়া যাইত। পরহিতব্রত গ্রহণ করিবে এই ছিল ওর সঙ্কল্প। মামাদের বলিয়া ডাক্তারী পড়িতে পাইয়া সেদিন ওর যা আনন্দ! আজও ওর মুখে তেমনই আনন্দের জ্যোতি। হরিশ তথাপি ওর অকৃত্রিম আনন্দে আনন্দিত হইতে পারিলেন না। আধারভেদে আলোর তারতম্য। বালক নীতিশ আজ যুবক নীতিশ হইয়াছেন। আধার বদলাইয়াছে।

বাড়ি ঢুকিতেই দয়াময়ী হাসিমুখে সম্মুখে আসিলেন। হরিশ তাঁহার পানে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ের পর বিস্ময় তাঁহাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করিতেছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, গুরুদক্ষিণা গো। আমার লাল পাড় শাড়ী—তোমার সাদা পাড় ধুতি। এমন জেদী ছেলে কাপড় পরিয়ে প্রণাম ক'রে তবে তার স্বস্তি। ব'লে গেল—মাষ্টার মশায়ের দৌলতে আজ মানুষ হয়েছি—

কে—কে? অত্যন্ত চাপা ভীরু গলায় হরিশ প্রশ্ন করিলেন।

নীতিশ—বিপিন মজুমদারের ভাগ্‌নে।

হরিশ হঠাৎ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, কাপড় প'রে—খুব আহ্লাদ করছ তো—ইস্কুলের ভাত কে দেবে শুনি?

দয়াময়ী বলিলেন, উমা রাঁধছে।

হরিশ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কেন ওকে রাঁধতে দিয়েছ? ছ'দিন বাপের বাড়ি এসেছে কি খেটে মরবার জন্যে? বুড়ো মাগী আক্কেল নেই—

দয়ামযী স্তম্ভিত বিস্ময়ে হরিশের ভৎর্সনা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ চাপা গলায় কহিলেন, আঃ হ'লো কি তোমার! উপযুক্ত ছেলে মেয়ের সামনে কি বলছো—যা—তা!

নিজের উচ্চ স্বর দ্বিগুণ রূঢ়তায় নিজের বুকে আসিয়া আঘাত করিল। হরিশ মরমে মরিয়া গেলেন। ছিঃ ছিঃ এমন অভদ্র রূঢ় চীৎকার জীবনে তিনি করেন নাই। কিসের আঘাতে ভিতরে ভিতরে এতখানি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন? যে জগৎ তাঁহার সম্মুখে ছিল তাহা পরিবর্ত্তনের কুয়াশায় মুছিয়া যাইতেছে? যে মানুষের মধ্যে তাঁহার আশা—বিশ্বাস—ভবিষ্যৎ ন্যস্ত করিয়া দেশমাতাকে পরম ঐশ্বর্য্যশালিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন সেই মানুষগুলি লক্ষ্যহারা হইয়া ভিন্নপথে চলিয়াছে—সেই দুঃখে?

বেত্রাহত ছাত্রের মত মাথা নীচু করিয়া তক্তাপোষের উপর গিয়া বসিলেন এবং বইয়ের স্তূপ হইতে একখানি মোটা মত বই তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। চোখে জল ছিল না, বৃত্তির উত্তাপে তাহা কখন শুকাইয়া গিয়াছে।

১২

পরের দিন বিষ্ণু ও শিবুকে পাঠ বলিয়া দিতেছেন—এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া বলিলেন, ওদের একটু ছেড়ে দাও—কাজ আছে।

কি কাজ?

বাজারে শা'দের দোকানে কেরোসিন তেল—আর চিনি দিচ্ছে—সার দিয়ে না দাঁড়ালে পাবার জো নেই।

চিনি কি হবে?

আজ জামাই আসবেন—একটু রস ক'রে পাতে না দিলে হয়! তা ছাড়া জামাই চা খান।

হরিশ প্রতিবাদ করিলেন না। কাল সকালের ঘটনায় দয়াময়ীর কাছে তিনি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়া আছেন। ছেলেরা চলিয়া যাইতেই উমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁরে উমা, গিরিশ চা খায় একথা তো আমায় কোনদিন বলিস নি!

উমা মুখ নামাইয়া কহিল, এখানে এসে তো চা খায় না।

হরিশ হাসিবার ভঙ্গি করিয়া মাথা নাড়িলেন, আমার ভয়ে —না রে?

উমা—হেঁটমুখে আড়চোখে বাপের পানে চাহিল।

তুইও খাস নাকি? তোর শ্বশুরবাড়ির সবাই খায় বুঝি?

চা খাওয়াটা এমন কি দোষের বাবা।

হরিশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু মা, অভ্যেস জিনিসটা বড় বালাই, ও ভাল নয়। একটু থামিয়া বলিলেন, অনেকে বলেন খরচ বাড়ালে আয়ের পথও বাড়ে। একটা কথা আছে না,

যে খায় চিনি
তার চিনি যোগান চিন্তামণি।

কিন্তু চিনি না খেয়েও তো চিন্তামণিকে চিনি যোগানোর পরিশ্রম থেকে রেহাই দিতে পারি।

উমা নতমুখে একটু হাসিল। বলিল, বেশ তো—চিন্তামণি যদি যোগান—আমরা কেন খাব না।

তা খাস—এক-আধ কাপ চা। আমি আজ এনে দেব।

না—বাবা, খেতেই হবে এমন নেশা নয় ও।

নেশা ব'লেই তো বারণ করি রে। তোর শ্বশুর তো আবার পান দোক্তা খায় এত এত। তোর অভ্যেস হয় নি তো?

কখনও সখনও পান খাই।

আচ্ছা উমা—জন্মে তো এ বাড়িতে পান খাস নি—তবে ও খেতে ভাল লাগে?

উমা বলিল, শাশুড়ী ছাড়েন না। বলেন, বউমানুষের ঠোঁট সাদা ফ্যাক্‌ফেকে হবে—দেখতে নাকি বিচ্ছিরি।

হাঁ—গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অন্যায়। তবে যাই খাও আর যাই কর—অভ্যাসের দাস কখনও হবে না।

উমা মাথা নাড়িল।

ছেলেরা যখন কেরোসিন তেল ও চিনি লইয়া ফিরিল হরিশ তখন আহারে বসিয়াছেন। বলিলেন, ওবেলায় তোমাদের পড়া নেব।

স্কুলে আজ আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। সুশীল অনুপস্থিত। একমাসের ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছে।

মাধব বলিলেন, শুনেছ—রেশন বরাদ্দ হচ্ছে। হরিশ কাগজখানা টানিয়া লইতেই মাধব বলিলেন, মাথা পিছু চাল—চিনি—আটা—নুন বরাদ্দ ক'রে দেবেন সরকার। এবার ব্ল্যাক্ মার্কেটের দফা গয়া।

সরকার দেবেন? আমরা নিজেদের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারি না?

পারলাম আর কই। বাইরের দোকানীর কথা ছেড়ে দিই, আত্মীয় স্বজন কে না কার গলা কাটবার চেষ্টা করছে। এই ধর না কাল সন্ধ্যেবেলায় এক ফোঁটা কেরোসিন তেল ছিল না—যে উনুন ধরে বা ছাত্র পড়াই। খুড়তুতো ভাই পটলের কাছে গেলাম তেল ধার করতে। বললে, ছ'টিন তেল আমার কাছে আছে—তবে সে আমার এক বন্ধুর। চড়া-দামে বেচবে ব'লে গচ্ছিত রেখেছে আমার বাড়িতে। কত দাম? ছ'আনার বোতলে চায় বার আনা। শুনেছ কখনও?

কয়েক দিনে বিস্ময়ের ঘোর হরিশের অনেকখানি কাটিয়াছে। সহজ কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করিলেন, কিনলে?

ক্ষেপেছ! মাধব সশব্দে ব্যঙ্গহাসি হাসিলেন। বারো আনায় এক বোতল তেল কেনার চেয়ে এক সের চাল কিনলে খেয়ে বাঁচব।

হরিশ বলিলেন, তাইত মাধব ইংরেজি প্রবচনটির দাম কমে গেল।

A man does not live by bread alone.

মাধব উষ্ণ হইয়া বলিলেন, রাখ তোমার ইংরেজি প্রবচন! অন্নচিন্তা চমৎকারা—একথা আমাদের সেরা কবি বলেছেন।

সেরা কবি যাই বলুন—ইতিহাস বলে অন্যরূপ। হরিশ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন।

ইতিহাসেও শ্লোক লেখা আছে বুঝি? মাধব ব্যঙ্গভরে বলিলেন।

আছে বই কি। হাজার হাজার বছর পিছনে চলে এস। —দেখবে আদিম মানুষ আর পশুতে কোন তফাৎ নেই। বাস তাদের গুহায়—আহার অর্দ্ধদগ্ধ পশুমাংস—পরিধান বল্কল। তখনকার যুগকে পাথর যুগ বলতে পার। তারপর এল লৌহ যুগ। মৃত্তিকা কর্ষণ—শস্য উৎপাদন—কুটীর তৈরী—এই সব। কিন্তু এই পাথর যুগেও আহার বিহার প্রভৃতি স্থূল বৃত্তিগুলো মিটিয়েও মানুষের ক্ষুধা যেন মিটতে চাইল না —তারা বাঁচতে চাইল এর চেয়ে সূক্ষ্ম কিছুতে অবলম্বন ক'রে। তারই চিহ্ন গুহার গায়ে—অতিকায় জন্তু গাছপালা প্রকৃতির অপটু অনুকরণ। প্রচুর অন্ন পেয়েও ওরা শান্ত হ'ল না— সৃষ্টি হ'ল ভাষা—লিপিমালা—। অন্নে মানুষের দেহটাই মাত্র বাঁচে—সেই দেহের বোঝা বয়ে বেড়ানো মনের পক্ষে দুঃসাধ্যই।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, যাই বলুন মশায়—যারা পেট ভরে খেতে পায়, তারাই বলতে পারে অন্নের চেয়ে সংস্কৃতি বড়। পেট ভরে না খেলে বড় বড় চিন্তার জন্ম হবে কোথা থেকে! কলির জীব হ'ল অন্নগত প্রাণ।

অন্নের মূল্য আমরা প্রচুর দিয়েছি—দিচ্ছি। দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা সশব্দেই বাহির হইল।

কি আর দিয়েছেন। পাড়াগাঁয় বসে কতটুকু জানেন তার? সেকেণ্ড মাষ্টার সোজা হইয়া বসিয়া কাগজখানা টানিয়া লইয়া এক জায়গায় আঙ্গুল রাখিয়া কহিলেন, look here—তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরেছে, আরও কত লক্ষ লোক মরবে তার ঠিকানা নেই।

থার্ড মাষ্টার বলিলেন, এ যে আনন্দমঠের দুর্ভিক্ষ!

না, সে মন্বন্তরে ধনী-দরিদ্র ভেদ ছিল না। মহেন্দ্রের মত জমিদাররাও রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এ মন্বন্তরে লাখপতিরা হচ্ছেন কোটিপতি। একদিন এর হিসেব নিকেশ হ'লে দেখবেন কত লক্ষ লোকের প্রাণ নিয়ে কত হাজার লোক উপরে উঠে গেছেন। সেকেণ্ড মাষ্টার গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিলেন।

হরিশ বলিলেন, আইন পর্য্যন্ত অচল হয়ে গেল এমন লোভ মানুষের!

ইস্কুলের ছুটির পর মাধব ও হরিশ নিত্যকার মত পথ চলিতেছিলেন। দুইজনেই চুপচাপ। দুইজনের মনে একই রকমের চিন্তা বহিতেছিল কিনা বলা কঠিন—কিন্তু দুর্ভিক্ষের করাল রূপটি দুইজনেই হয়তো প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

মাধব বলিলেন, এই মন্বন্তর কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর। আমরা হয়তো শেষ হয়ে যাব।

হরিশ বলিলেন, শেষ হতে আমাদের বাকি কি মাধব! তুমি অন্ন-দুর্ভিক্ষটা বড় ক'রে দেখছ, আমি শুধু ভাবছি ইংরেজ মনীষীর কথা কত সত্য। সত্যই মানুষ অন্নের মধ্য দিয়ে বাঁচতে পারে না। এ আমরা কোথায় নামছি—কোথায় চলেছি!

বাজারের রাস্তায় লম্বা মত একটা লাইন দেখা যায়। আট দশ বারো বছরের ছেলেমেয়েরা ঠেলাঠেলি করিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধও সে লাইনে আছেন।

মাধব একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে কি দিচ্ছে খোকা?

চিনি।

বই হাতে অনেক স্কুলের ছেলেও দাঁড়াইয়া আছে। মাঝের লাইনটা লেজের মত কয়েকটা পাক খাইয়া রাস্তাটা রুদ্ধ করিয়াছে।

দাঁড়াবে নাকি?

হরিশ বলিলেন, খেপলে মাধব! বাড়ি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দাও না হয়।

দুর—তাহ'লে আজ আর পেতে হবে না। ছেলেরা আসতে আসতেই—লাইন আরও পঞ্চাশ হাত বেড়ে যাবে।

মাধবের সামনে একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি

তাহার হাত ধরিয়া নিজের পিছনের দিকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, লাইন ভেঙ্গোনা বাবা—এইদিকে।

বাঃ রে—আপনি তো গল্প করছেন।

গল্প করছি—লাইন তো ভাঙ্গিনি।

হরিশ বলিলেন, Struggle for existence বড় কঠিন ভায়া।—ছেলে নাতি কাউকে সে রেয়াত করে না। কথা শেষে হরিশ হাসিয়া উঠিলেন।

মাধব রাগ করিয়া কহিলেন, তোমার কি!—চা খাও না—

অতঃপর মাধব কি বলিলেন—হরিশ কান দিলেন না।

চিনি দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের লাইন চঞ্চল হইয়া পাক খাইতেছে। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের তাহাতে উল্লাসই বাড়িয়াছে বরং। এ এক নূতন ধরণের খেলা।

উল্লাসের কারণ আরও কিছু দূরে আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন হরিশ। সামনাসামনি দু'টি ময়রার দোকানেও ইতিমধ্যে ছেলেদের ভিড় জমিয়া গেল। চিনি লইবার জন্য নহে—দিবার জন্য। একজন লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল আর হাসিতেছিল।

হরিশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

লোকটি চিনির দোকানের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া কহিল, ওইখানে কন্‌ট্রোলের চিনি আট আনায় কিনছে। ময়রার দোকানের দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া কহিল, এইখানে একটাকায় বেচছে। বেচেই—ছুটে চলে যাচ্ছে আবার লাইনে। আবার কিনছে—বেচবে। এক পোয়ার বেশি দেয় না তো কাউকে। পরে হো-হো করিয়া হাসিয়া কহিল, বড় হলে এরা কিন্তু পাকা ব্যবসাদার হবে মাষ্টার মশাই।

১৩

একি, শুয়ে পড়লে যে, পড়াতে যাবে না ?

না—শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

দয়াময়ী সরিয়া আসিয়া হরিশের কপালে হাত রাখিলেন।

হরিশ হাসিয়া কহিলেন, ওখানে নয়, ওখানে নয়। বলিয়া হাতখানি তাঁহার টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

তুমি ছুটি নাও—দিনকতক।

কে দেবেন ছুটি ? ভগবানের সাধ্য নেই আমায় ছুটি দেন।

আচ্ছা—তুমি দিন দিন অত মুষড়ে পড়ছ কেন বলতো ?

কই, না—ঠিক আছি। কি জান—মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

কেন—কিসের ভুল ?

দয়াময়ীর হাতখানি দৃঢ়ভাবে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কি মনে হয় না দয়া—জগৎটা বড় তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে ! বড্ড তাড়াতাড়ি।

বদলাক, আমরা আর ক'দিন! দয়াময়ী নিঃশ্বাস চাপিতে মুখ ফিরাইলেন।

এইতো, শঙ্করাচার্য্য আনলে! মানলাম তুমি থাকবে না—আমি থাকব না—কিন্তু মানুষ থাকবে তো।

তা কেন থাকবে না!

থাকবে না—থাকতে পারছে না। মানুষ চলে যাচ্ছে দয়া। বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

কিছু যায় না। ভগবানের সৃষ্টি কি নষ্ট হবার! দয়াময়ীর কণ্ঠে আশ্বাসের সুর।

হরিশ সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া সোৎসাহে বলিলেন, ঠিক—ঠিক। ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট হবার নয়। তবে আমরা পারছি না—নিজেদের কর্ত্তব্য করতে।

ওকি উঠে যাচ্ছ কোথায়?

ছেলেটাকে পড়িয়ে আসি। ঘরে তেল নেই বেলাবেলি কাজ সেরে রাখা ভাল।

ছাত্রের বাড়ি যাইবার পথে নাতিবৃহৎ একটি মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে জনতা। পঞ্চাশ ষাট জন লোক জড়ো হইয়া কি শুনিতেছে। একটা মিটিঙ্‌ই বোধ হয়। ব্যূহবদ্ধ বক্তাকে দেখা যায় না—তার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। হরিশ অগ্রসর হইয়া জনতা-সংলগ্ন হইলেন।

সভাপতির আসনে একজন আধাবয়সী লোক ফুলের মালা গলায় দিয়া বসিয়া আছেন—সুশীল সোৎসাহে বক্তৃতা করিতেছে :

ভাই সব—মুনাফালোভীদের ধ'রে ধ'রে শাস্তি দাও। ধনিকতাবাদ ধ্বংস কর। ডিক্টেটারী শাসন আজ সমাজের সর্ব্বস্তরে বিষের মত ছড়িয়ে গেছে। মন্দির বল, মসজিদ্ বল, সমাজ বল, বিদ্যালয় বল, লীগ বল, কংগ্রেস বল, নিজের সংসার—কোথায় না এর প্রভাব? একদিন প্রতিজ্ঞা ক'রে যেমন কচুরিপানা ধ্বংস করেছিলে তেমনি প্রতিজ্ঞা কর এই সব অনাচার দূর করবে। জেঁাকের মত—রাস্নালতার মত যারা তোমাদের কাঁধে চেপে বসেছে—নামিয়ে দাও তাদের জোর ক'রে। সর্ব্বহারাদের জন্য এগিয়ে এস।

হরিশ ফিরিলেন। হয়তো সুশীল তাঁহাকে দেখিয়াই চীৎকার আরম্ভ করিল : আমরা ক্ষমা করবো না যেমন কুলোকদের তেমনি old fossilদের। ওরা তাজা বিদ্রোহের মূল্য স্বীকার করে না—তারুণ্যকে অগ্রাহ্য করে। সব কিছু পুরাতনকে ধ্বংস করতে না পারলে আমাদের নিস্তার নেই। সমাজে বিপ্লব না এলে, রাষ্ট্রে বিপ্লব আসবে না।

হরিশ আপন মনে বলিলেন, এঁরাই কি মানুষের পরম বন্ধু। রাষ্ট্রবিপ্লবের বাণী প্রচার করছেন, দুর্ভিক্ষের সুযোগে

মানুষকে উত্তেজিত ক'রে তুলছেন। কিসের প্রেরণায়? কার বিরুদ্ধে?

সন্ধ্যার মুখে ছেলে পড়াইয়া ফিরিবার পথে বাজারের রাস্তায় প্রচণ্ড কোলাহল শোনা গেল। আর একটু আগাইয়া আসিয়া লোকের ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইয়াছে। পথ চলা দুষ্কর।

গোবর্দ্ধন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে হরিশের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। হরিশ তাহার হাত ধরিলেন।

কি গোবর্দ্ধন—এমনভাবে ছুটে চলেছ কোথায়?

সর্ব্বনাশ হয়েছে—মাষ্টার মশাই। যদুর দোকান লুট হয়ে গেল।

তুমি ছুটছো কেন?

কতকগুলো চ্যাংড়া ছেলের এই কাজ। আবার শাসাচ্ছে যার যার ঘরে চাল মজুত আছে সব লুট করবে।

ওদিকে অত আলো কেন?

ইস্, বোধহয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যদু লোক পাঠিয়েছে সদরে রিপোর্ট করতে। বাছাধনরা ঘুঘু দেখেছেন—ফাঁদ দেখবেন এইবার।

আগুন আরও ছড়াইয়া পড়িল। সন্ধ্যার আকাশ লাল টক্‌টকে হইয়াছে। লোকের কোলাহলও ক্রমে বাড়িতেছে।

অরুণোদয়ে পূবের আকাশে যে রক্তিম-ছটা নব প্রভাতের সঙ্গে নবজীবনের সূচনা করে এ অগ্নি-অক্ষরে তার আভাস মাত্র নাই; চিতার আগুনের মত এর লেলিহান শিখা আকাশের দিকে ক্ষুধার্ত্ত জিহ্বা মেলিয়াছে, প্রচুর ধূমে আবৃত হইয়াছে—দিক্‌মণ্ডল।

হরিশ সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাজার ছাড়াইয়া একটা কাণা গলির মধ্য দিয়া যত্নর বাড়ি পৌঁছিবার সোজা পথ আছে। এককালে যত্নকে পড়াইতে যাইবার সময় এই পথটি তিনি ব্যবহার করিতেন। এ পথে বড় কেহ চলে না বলিয়া কালকাসুন্দা ও ধলা-আঁকড়ার ঝোপ হইয়াছে। যত্নদের বাড়ি হইতে ময়লা জল আবর্জ্জনার সঙ্গে ভাসিয়া গলিটাকে মানুষের দুষ্প্রবেশ্য করিয়াছে। আগুন দেখিয়া হরিশের সোজা পথটির কথাই মনে হইল—এবং তাড়াতাড়ি গলির মধ্যে ঢুকিয়াই বুঝিলেন—ভুল করিয়াছেন। কিন্তু ভুলের মধ্যেও বিধাতার ইঙ্গিত মাঝে মাঝে মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়। বিপরীত দিক হইতে কাঁটা-ঝোপ ঠেলিয়া কে তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেই তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন, কে?

কিশোর বয়সের একটি ছেলে—বলবান তো নহেই। বলবান হইলেও—তার পক্ষে হরিশের বজ্রমুষ্টি ছাড়ানো কঠিনই হইত।

হরিশ যৌবনে ভারত উদ্ধারের স্বপ্নে মাতিয়া রীতিমত শক্তিসাধনা করিতেন। সে শক্তির চিহ্ন এখনও দেহের তটে লাগিয়া আছে। হাতের পেশী শুকাইয়াছে কিন্তু চওড়া হাড় ও মোটা মোটা আঙুলগুলি সাড়াশীর মতই শক্ত। ছেলেটি যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল।

এই শক্তি নিয়ে লোকের ঘরে আগুন লাগাতে এসেছ? ছিঃ!

ছাড়ুন—ছাড়ুন হাত।

তোমার নাম কি? কে, কে, তোমার সঙ্গে আছে?

বলব না।

বটে! হরিশ হাত ধরিয়া হেঁচকা টান দিতেই ছেলেটি ধলা-আঁকড়ার কাঁটা ঝোপে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সামনের দিক হইতে একটা আলো ছুটিয়া আসিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, এই দিকে এই দিকে—

ঝোপ দলিত মথিত করিয়া কে বা কাহারা দ্রুতপদে ছুটিয়া পলাইল। হরিশের হাতের মুষ্টি কখন আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, ছেলেটিও ছুটিয়া পলাইয়াছে।

আলো নিকটে আসিতেই যতুর গলা শোনা গেল, একি, মাষ্টার মশায়, এখানে দাঁড়িয়ে? কেউ ছুটে পালায় নি?

হরিশ সে কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাড়িতে আগুন দিলে কে ?

যারা পালিয়ে গেল—এই মাত্তর। ওদের আমি জানি। দোকান লুট করেছে ব'লে সদরে রিপোর্ট করতে লোক পাঠিয়েছি কিনা—তাই এই আক্রোশ। আপনি কাউকে চিনতে পারলেন—মাষ্টার মশায় ?

না।

অনেক রাত্রিতে হরিশ বাড়ি ফিরিলেন।

১৪

বেলা দশটা। স্কুলে যাইবার জন্য বাড়ির বাহিরে পা দিয়াছেন—লালপাগড়ীধারী একজন কনষ্টেবল আসিয়া জানাইল ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব তাঁহাকে সেলাম দিয়াছেন।

যদুর বৈঠকখানায় ছোটখাটো জনতার সৃষ্টি হইয়াছে। পদোচিত গাম্ভীর্য্যে ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব চেয়ারে বসিয়া আছেন। একজন লালপাগড়ী ঘরের মধ্যে ও একজন বারান্দায় পাহারা দিতেছে। ঘরের মধ্যে গ্রামের পদস্থ ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা কহিতেছেন ও পরস্পরের গা ও চোখ টিপিয়া কোন গুরু বিষয়ের ইঙ্গিত করিতেছেন। বারান্দায় ও পথে—কৌতূহলী দর্শকের ভিড়।

অনেকের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, দুই একজনের বাকি আছে। তার মধ্যে হরিশ একজন।

ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আপনি একজন প্রবীণ শিক্ষক—গ্রামের সবাই আপনাকে মান্য করে। সত্যি

ক'রে বলুন তো যখন কাণা গলি দিয়ে যদুবাবুর বাড়ি আসছিলেন —তখন ক'জন ছোকরা আপনার সামনে দিয়ে পালিয়ে গেল ?

তা ঠিক বলতে পারি না।

তাদের কাউকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন ? ঠিক ক'রে বলুন ?

হরিশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, মিথ্যা কথা জীবনে বলিনি।

বেশ তো—যে পালিয়ে গেল তার নামটি বলুন তো ?

অন্ধকারে মানুষ চিনতে পারলাম না, নাম বলব কোন্ ভরসায় ?

কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?

হরিশ হাসিয়া বলিলেন, আপনি নতুন ইন্‌স্‌পেক্টর না হ'লে যদুকে এ-কথা জিজ্ঞেস করতেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, পুলিশের কাজ সবাইকে সন্দেহ করা। আপনার নামেও চার্জ্জ আনা যেতে পারে। কেন না, নোঙরা গলি—যেখানে মানুষ দিনের বেলায় চলে না —সেখানে অন্ধকারে কোন্ উদ্দেশ্যে আপনি গিয়েছিলেন ?

যদু তাড়াতাড়ি ইন্‌স্‌পেক্টরের কাঁধের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কহিল। ইন্‌স্‌পেক্টর বার দুই মাথা নাড়িয়া হরিশের পানে ফিরিলেন।

আচ্ছা যান। পুলিশের কাছে সত্য গোপন আর অশিষ্ট মন্তব্য দুইই ক্ষতিজনক।

হরিশ ফিরিয়া কি বলিতে গিয়া আপনাকে সম্বরণ করিলেন। জনতা দেখিল তিনি মৃদু হাসিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া যাইতেছেন।

রাস্তায় পা দিয়াছেন, কোথা হইতে কে বলিল, Old Fossil.

এদিক ওদিক চাহিয়াও হরিশ কাহাকেও দেখিলেন না, শুধু বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি কিশোর ছেলে অকুতোভয়ে বিড়ি টানিতেছে।

বিড়ির গন্ধটা হরিশ কোনকালে সহ্য করিতে পারেন না, এবং বহুদূরে কেহ বিড়ি টানিলেও সে গন্ধ নির্ভুল ধরিতে পারেন। বিছানায় শুইয়া মধ্য রাত্রিতে তাঁহার মনে হইল—তাঁহার পাশেই কে যেন বিড়ি টানিতেছে। আলো নাই—জানালাটা খোলা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলেও বাহিরের অন্ধকার তত গাঢ় নহে। সেই তরল অন্ধকারে মনে হইতেছে—ধোঁয়ার একটা সরু রেখা অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁহার জানালা পার হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছে। জানালার ধারে তিনি উঠিয়া আসিলেন।

পাশের ঘরেই উমারা কথা কহিতেছে। গিরিশ অস্ফুটস্বরে

গল্প করিতেছে—উমা কখনও সায় দিতেছে—কখনও হাসিতেছে। সমস্তটাই চলিতেছে সন্তর্পণে। গুরুজনের সম্মান রাখিয়া মধ্য-রাত্রির নিস্তব্ধক্ষণে দুইজনেই হারাইয়া গিয়াছে। পুরাতন-কালের কুক্ষিতে নূতনকালের রোমাঞ্চ লাগিতেছে; নূতন কাল সর্ব্বদাই উদ্ধত নহে—অসংযত নহে। দুই কালের সংযোগ-সেতুতে যে বস্তু নিত্য প্রকাশমান—পৌরাণিক যুগ হইতে নিরীশ্বরবাদ যুগ পর্য্যন্ত তাহা দেবতা না হইয়াও দেবতার অধিক। হাসিয়া তিনি জানালাটা বন্ধ করিলেন।

রবিবারে স্কুল নাই—সংসারের ছোটখাটো অনেকগুলি কাজ আছে। কিন্তু ছুটির দিনে খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি মাইল খানেক দূরে গঙ্গাস্নানে যান। প্রকাণ্ড কয়েকটি মাঠের মধ্য দিয়া গঙ্গায় যাইবার পথ। খোলা মাঠ, অবারিত বায়ুর দাক্ষিণ্যে শরীর জুড়াইয়া দেয়। দক্ষিণমুখী গঙ্গা। পাশে পূবের আকাশে লাল রঙ ধরিয়াছে। কোন কোন দিন গানও ধরেন। একলা নহে—মাধব তাঁহার সঙ্গে থাকেন।

মাঠে পা দিয়াই হরিশ গুন্ গুন্ করিয়া একটি ভজন গানের কলি ভাঁজিবার উদ্যোগ করিতেছেন—মাধব বলিলেন, কাল তোমার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করছিল কেস্, কোন কিনারাই হ'লো না।

হরিশ সস্মিত মুখে তাঁহার পানে চাহিয়া কহিলেন, ভজন

গানের একটা কলি মনে পড়ছে—মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলি নন্দলালা। ওর গোড়াটা জান ?

মাধব বলিলেন, না। ওটা রেকর্ডে বোধ হয় উঠেছে—

হরিশ বলিলেন, গ্রামফোন বুঝি খুব শোন ?

মাধব বলিলেন, খুব আর কোথায়, পরশু যদুর দোকানে বাজছিল—। হাঁ—ভাল কথা, যদু বড় দুঃখিত হ'য়েছে।

হরিশ বলিলেন, কি ক'রব মাধব—অনুমানে মানুষকে সন্দেহ করা চলে না।

মাধব কহিলেন, অনুমান নয়—প্রত্যক্ষ। ওরা আমাদের যখন তখন বিদ্রূপ করে—

এক পক্ষ অবোধ হ'লে—অন্য পক্ষকেও অসহিষ্ণু হ'তে হবে ?

মাধব বলিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মত সহিষ্ণুতা ক'জনের থাকে।

মহাত্মা গান্ধীও তো মানুষ।

মাধব বলিলেন, যাই বল—যদু সন্ধানে আছে—সুবিধা পেলে দলকে দল ফাঁসিয়ে দেবে।

তা যদু পারে।

আচ্ছা—ওই দলকে তুমি সমর্থন কর ?

হরিশ হাসিলেন, মাত্র এক জায়গায় ওদের সঙ্গে আমার মেলে নইলে সর্ব্বত্র অমিল।

কোন্ জায়গাটায় মেলে ?

কি জান মাধব—পথ ভিন্ন—মত ভিন্ন। সব দেবতার এক ফুলে পূজা হয় না—মন্ত্রও এক নয়—তবু সব দেবতাকে মিলিয়ে —যে এক আসল দেবতা আছেন, তিনি পান পূজো। সেখানে কোন ভুল নেই।

স্বদেশ বুঝি সেই দেবতা ?

হরিশ গুন্ গুন্ করিয়া গাহিলেন :

প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে—
জাগ্রত ভগবান হে জাগ্রত ভগবান।

১৫

স্নান-তর্পণ শেষ হইলে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া গীতা বা মহাভারত পাঠ করেন। ছুটির দিনে এইগুলিতে মনোযোগ গভীর হইবারই কথা। আপন মনেই শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া চলেন—ব্যাখ্যা করেন, টীকা অন্বয় ভাষ্য প্রভৃতি অনর্গল উৎসারিত হইতে থাকে। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া লোকে ভাবে, হরিশ মাষ্টার এক ঘর শ্রোতা লইয়া কথকতা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু একঘর শ্রোতা কিংবা একটি মন যে-কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যার আনন্দস্রোত অবারিত বহিতে থাকে। নিত্য প্রকাশিত বস্তুতে আনন্দের অমৃত প্রবাহ; বস্তু অনিত্য কিন্তু আনন্দ-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অব্যয়। কর্ম্মের দ্বারা যে আনন্দ সঞ্চিত হয়—অণুতম হইলেও পরম আনন্দের একটা চৈতন্যময় অংশ। কর্ম্ম না করিলে পদে পদে জাড্যের দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। বন্ধনের পীড়ন আরম্ভ কোনখানে? কর্ম্মকে উপলক্ষ্য করিয়া তার ফলে গভীর আসক্তি যদি

ঘটে। না না, মন হইবে পদ্মপত্রের মত—পাঁকাল মাছের মত।

পূজা-পাঠ শেষ হইলে বারান্দায় আসিয়া বসিতেই গিরিশ তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল।

কার চিঠি? জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেশের চিঠি। সবটা পড়িয়া হরিশের প্রসন্ন মুখে কয়েকটি রেখা ফুটিয়া উঠিল। জামাতার পানে ফিরিয়া কহিলেন, এ আমি আশা করিনি।

গিরিশ বলিল, চারদিকের অবস্থা দেখে তার মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েছে। ক'দিন থেকেই বলছে সংসারের জন্য একজনকে আত্মত্যাগ করতেই হবে।

সে একজন অমরেশ নয়। ও আমার প্রথম ছেলে—সদ্দৃষ্টান্ত। ওকে দেখেই অন্য ছেলেরা শিখবে। জান গিরিশ, স্তম্ভ অমজবুত হ'লে মন্দির সুদৃঢ় থাকে না।

আপনার অনুমতি চেয়েছে—

বুঝেছি তার মন চঞ্চল হ'য়েছে। আমার আশা ফলবতী হ'লো না। ক্ষুদ্র একটি নিঃশ্বাসমোচন করিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন।

এই মাত্র গীতার শ্লোকে পড়িয়াছেন:

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ—

শ্লোক শুধু পুঁথির পাতায় মানায়, কণ্ঠের ধ্বনিমাধুর্য্যে

অপরূপ শোনায়—জীবনে পরীক্ষার ক্ষেত্র আসিলে তার যথার্থ মূল্য গ্রহণ করা কঠিন ? হাঁ—কঠিন বৈকি।

মধ্যাহ্নে জামাতাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি আর কলেজে যায় না ?

জামাতা মাথা নীচু করিয়া জবাব দিল, ক'দিন থেকে—

কোথাও চাকরির দরখাস্ত দিয়েছে ?

হাঁ—দু'একখানা—

আচ্ছা যাও। জামাতা দুয়ারের বাহির হইতেই তাহাকে ডাকিলেন, হাঁ—শোন—তাকে বলো এতে আমি সুখী হ'ব না। কর্ত্তব্য নেবার দায়িত্ব এখনও তার আসেনি—যতক্ষণ আমি রয়েছি।

দয়ামযী আসিলে বলিলেন, আচ্ছা—নিজের আদর্শ অন্যের ঘাড়ে চাপালে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়—কি বল ?

দয়ামযী কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর পানে চাহিলেন।

মানে আমার মতে যদি তোমাকে জোর ক'রে চালানো হয় —কষ্ট হবে না ?

তথাপি প্রশ্নটা দয়ামযীর কাছে পরিস্ফুট হইল না।

হরিশ হাসিয়া বালিশের তলা হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া দয়ামযীর হাতে দিয়া বলিলেন, কিছু পান আর বিড়ি আনিয়ে দিয়ো।

দয়াময়ী শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন, কি বলছো ?

হরিশ হাসিলেন, ভয় নেই—আমি খাব না। আজ মনে হচ্ছে—নিজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা ভাল—তবু অন্যকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

দয়াময়ী সিকিটা মাহুরের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, যার যত কষ্টই হোক—এ বাড়িতে যে জিনিস কখনও আসেনি—তা কখনও আসবে না।

হরিশ কহিলেন, দয়া, তুমি শুধু নির্ব্বোধ নও—অন্ধও বটে। সংসার যখন আমাদের ছিল—আমাদের মতটাই তখন চলেছে। শাস্ত্রকাররা পঞ্চাশোর্দ্ধের কথাটা মিছেই বলেন নি। এখন আমাদের মত চালালে—সংসার চলবে বটে—শব্দ উঠবে বিশ্রী। সে সহ্য করতে পারবে ?

যাই হোক—এ আমি হতে দেব না।

দয়াময়ী চলিয়া গেলে—হরিশ কি জানি কেন অকারণে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া পতাকা বহিবার প্রাণীও আছে এ সংসারে। বস্তু-সংঘাতে—কাল-সংঘাতে আদর্শ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে ? না, আদর্শ স্থির আছে—শুধু রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে।

কি রূঢ় পরিবর্ত্তন !

সপ্তাহ পরে অমরেশের নিকট হইতে পত্র আসিল। বহু অনুনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে লিখিয়াছে—সব শুদ্ধ আশী টাকা—এ আমি ত্যাগ করতে পারলাম না। তবে পড়া ছাড়বো না। চাকরিটা মনে করবো ট্যুইশন। কত লোকেই তো দেখছি—দু'কূল বজায় রাখছেন।

লেখা ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে। বার বার মাথা নাড়িয়া হরিশ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, দুকূল বজায় রাখা চলে না—ওরে বোকা ছেলে, উপার্জ্জনের নেশা মনে লাগিলে—জ্ঞানের পিপাসা যে আপনিই মিটিয়া যায়। উপার্জ্জনের কি শেষ আছে অর্থের বা জ্ঞানের রাজ্যে? বর্দ্ধিত আকাঙ্ক্ষায়—দিনের পর দিন তা দুর্ব্বার হইয়া উঠিবেই।

শীতের আকাশ—হিম-জড়ানো অস্পষ্ট নহে। তারায় তারায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে নীল আস্তরণ। আকাশের উত্তর কোণে—সপ্তর্ষির পাশ কাটাইয়া একটা আলোর লাইন ইরম্মদ বেগে পৃথিবীর দিকে চলিয়া গেল। কক্ষচ্যুত নক্ষত্র। মনে মনে রাম নাম উচ্চারণ করিলেন হরিশ।

১৬

মহিমবাবু বাড়ি আসিয়াই মাষ্টারদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ধূনার ধোঁয়ায় বৈঠকখানা ঘর হইতে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতেছে। তাকিয়া হেলান দিয়া মহিমবাবু আড় হইয়া পড়িয়াছেন; শীতকাল বলিয়া চায়ের ব্যবস্থা আছে।

চা খান, মাষ্টার মহাশয়।

হেড মাষ্টার ও সেকেণ্ড মাষ্টার চায়ের কাপ তুলিয়া লইলেন। পণ্ডিত মশায়, মাধব ও হরিশ হাত বাড়াইলেন না।

আপনারা! ওঃ—একটু জলযোগ যদি অনুগ্রহ ক'রে করেন —ওরে ভজুয়া।

হরিশ ব্যতীত কেহই আপত্তি করিলেন না।

মহিমবাবু বলিলেন, তুমি যে নিলে না মাষ্টার?

হরিশ বলিলেন, এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক করিনি—

পণ্ডিত মশাই রসগোল্লা মুখের কাছে তুলিয়াছেন—নামাইতে পারিলেন না। একবার এদিক ওদিক অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চাহিয়া

মুখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া কহিলেন, কোথাও বেরুতে হ'লে সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে বেরুনোই ভাল।

হরিশ হাসিলেন, আমার জলখাবার খাওয়ার অভ্যাস নেই।

মহিমবাবু বলিলেন, কোশাকুশি, গঙ্গাজল, শুদ্ধ বস্ত্র সবই মজুত আছে। ঠাকুরঘরে ব'সে না হয়—

হরিশ হাসিমুখেই বলিলেন, ব্যস্ত হবেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ঠিক নিয়ম রাখা বাইরের ব্যাপার নয়। মন যুক্ত না হ'লে মন্ত্র আউড়ে লাভ!

মহিমবাবু আর কথা বাড়াইলেন না—আসল উদ্দেশ্যে আসিলেন, হাঁ—কেমন চলছে ইস্কুল? গেলবার পাসের পার্সেন্টেজ বড্ড পুওর ছিল—এবার দেখবেন যেন এইট্টি পারসেন্টের কম না হয়।

হেড মাষ্টার কহিলেন, চেষ্টা তো করবো। তবে আমাদের ইস্কুল নয়—তু'বছর দেখা যাচ্ছে প্রায় সব ইস্কুলেরই এক অবস্থা। বিশেষ পাড়াগাঁয়ের ইস্কুল।

কেন বলুন তো? ইভ্যাকুয়েশনের জন্য সহরের ইস্কুল বন্ধ হয়েছিল মাসকতকের জন্য, তাতে শহরের ক্ষতিই কিছু হ'য়েছে। পাড়াগাঁ'র এমন অবস্থা—

সেকেণ্ড মাষ্টার কহিলেন, বড় বড় তুর্ভিক্ষ গেল—মানুষ সুস্থির না হ'লে লেখাপড়া করবে কিসে। আজ চাল নেই—

কাল নেই আটা চিনি—কেরোসিন তেলের দোকানে রোজ 'কিউ' দিয়ে দিয়ে ছেলেগুলোর পদার্থ আছে! পড়বার সময় কোথায় ওদের।

মহিমবাবু বলিলেন, কারণ ওইটিই কি সব?

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, তার পর পড়া। স্বাস্থ্য বজায় থাকে এমন কি জিনিস পাচ্ছি আমরা! বাজারে—দুধ ঘি অমিল—মাছ কেনা চলে না। কি খেয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্য বাড়বে—মেধা হবে।

মহিমবাবু বলিলেন, সবই মানি। জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে যে লেখাপড়া ভাল হ'চ্ছে না তা নয়। এর আসল কারণ কি জানেন? হুজুগ।

হুজুগ!

হাঁ। শহরে তো দেখছি—এত অভাব—এত হাহাকার অথচ সিনেমা থিয়েটার ফুটবলের মাঠে লোক ধরে না। তিন টাকা সেরের মাছ—এক টাকা সেরের দুধ না কিনছে কে? যে লক্ষপতি সে-ও যা খায়—যে আশী টাকার কেরাণী সেও তাই কেনে। কিন্তু নানান দিক থেকে নানান জিনিস এমন ভিড় ক'রে এসেছে আমাদের সামনে—সবাই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। এ ভাল নয়।

হরিশ ভাবিলেন, হয়তো সবটাই সত্য। বাহিরের অভাব

আর চিত্তের দৈন্য মানুষকে যে দিকে ঠেলিতেছে সেটা কল্যাণের দিক নয়। যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব কোন্ কালে মানুষের কল্যাণ করিয়াছে? তবে যে দায় আমাদের নহে—তার দায়িত্বই আমাদের পঙ্গু করিয়া দিতেছে।

মহিমবাবু কহিলেন, সে যাই হোক—আমি বুঝতে পারছি—আমাদের ছোট ইস্কুল এই হুজুগ থেকে রেহাই পায় নি। সেবার এসে যা দেখে গেলাম অঙ্কুর—এবার দেখছি তা মস্ত গাছ। যত্নুর আড়ত পুড়েছে—দোকান লুট হয়েছে—আরও অনেককে শাসিয়েছে। আরও জানলাম—এই সবের মূল আমার ইস্কুলের মধ্যেই রয়েছে। আপনারা কি ষ্টেপ নিয়েছেন তার?

শেষের দিকে কথাটা রূঢ় কৈফিয়ৎ দাবীর মতই শোনাইল।

হেড মাষ্টার বলিলেন, ইস্কুলের মধ্যে কিছুই নেই।

মহিমবাবু সোজা হইয়া বসিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন, ইস্কুলের মধ্যেই এর মূল আছে। আমি জানি—ছেলেরা নিয়মিত পড়া করে না—মাষ্টাররা নিয়মিত হাজিরা দেন না। সুশীল মাষ্টার আসে ইস্কুলে?

তিনি এক মাসের ছুটি নিয়েছেন।

ছুটি! কে দিলে তাকে ছুটি? আমার পারমিশন না নিয়ে—

ইস্কুলের নিয়মে বাধে বটে। হেড মাষ্টার নতমুখে বলিলেন, আজ্ঞে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করলে—ভাবলাম—আপনার আপত্তি হবে না—তাই—

মহিমবাবু কথা না বলিয়া উগ্রচক্ষে হেড পণ্ডিতের পানে চাহিলেন, অ্যাপলজি লেটার পেয়েছিলেন আপনি ?

হেড পণ্ডিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। হেড মাষ্টার বলিলেন, তিনি ইস্কুলে এলেই—

এ্যাপলজি, রিটিন অ্যাপলজি। সে ইস্কুলে আসুক চাই না আসুক তিন দিনের মধ্যে আমি দেখতে চাই। উত্তেজনায় খাড়া হইয়া বসিয়া কোলের তাকিয়াটায় প্রচণ্ড একটা চাপ দিলেন।

ঘরের মধ্যে সূচ পড়িলে শব্দ শোনা যায় এমন নিস্তব্ধতা। ক্লক ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ সকলের বুকে ঘা মারিতেছে শুধু।

অনেকক্ষণ পরে হেড মাষ্টার কহিলেন, ড্রাস্‌টিক ষ্টেপ নিলে—ষ্ট্রাইক হতে পারে।

কি! ষ্ট্রাইক—স্কুলে ষ্ট্রাইক! জেলা থেকে আর্ম্মড পুলিশ আনিয়ে সব ঠাণ্ডা ক'রে দেব না! ষ্ট্রাইক—! চোখ পাকাইয়া তিনি চারিদিকে চাহিলেন।

হরিশ বলিলেন, স্কুল নিয়ে কথা, অধৈর্য্য হয়ে কিছু ক'রে বসলে—

না মাষ্টার—যে বিয়ের যে মন্ত্র। আইন-অমান্য আন্দোলন দেখেছিলে তো? তখনকার বড়লাট—নেতাদের জেলে পুরে কেমন ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিলেন তা মনে পড়ে?

হরিশ বলিলেন, পড়ে। তারপর হ'লো আগষ্ট আন্দোলন। জেল, নির্য্যাতন—মৃত্যু। আন্দোলন যায়—নতুন হয়ে তা ফিরে আসে। স্পিরিট কখনো নষ্ট হয় না।

স্পিরিট! জগতের যুদ্ধে তোমরা যোগ দাও নি? কংগ্রেস বললেন, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের, যুদ্ধে কেউ যোগ দিয়ো না; মুসলিম লীগ সরে দাঁড়ালে। দেখগে কলকাতায় হাজার হাজার লোক সেপাই হবার জন্য, কেরাণী হবার জন্য কর্ত্তাদের দুয়োরে ধর্ণা দিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সেপাই সাগর পারে পাড়ি দিয়েছে। দুর্ভিক্ষ এলো—সেপাই বাড়লো, কেরাণী বাড়লো। কোথায় তোমার স্পিরিট—মাষ্টার?

হরিশ প্রশান্তকণ্ঠে বলিলেন, ঢেউয়ের পেছনে ঢেউ আসে, ঢেউ নিঃশেষ হয়ে যায় না। কংগ্রেস যে মন্ত্র শুনিয়েছে—তা শূন্যে ভেসে যাবার নয়। ভারতের আত্মা অমর—অজয়। এ স্পিরিট—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—নৈনং দহতি পাবক—

হরিশ আর অপেক্ষা করিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন।

হরিশের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা তথা মহিমবাবুর স্পিরিটও নীচের ডিগ্রিতে নামিয়া গেল। মিনিট দুই নিঃশব্দে

কাটিবার পর তিনি কহিলেন, ওর পাগলামী চিরদিনই গেল না। জানেন পণ্ডিত মশায়—মিলিটারি এ্যাকাউণ্টস্'এ ভাল অফার পেয়েছিল—যদি চাকরি নিতো—আজ ও যেতো অফিসার গ্রেডে। তাকিয়ার উপর হেলান দিয়া তিনি গড়গড়ার নলটি মুখের কাছে তুলিয়া লইলেন।

ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দে কয়েকটা টান দিয়া ও একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া লুপ্ত প্রসঙ্গকে টানিয়া তুলিলেন মহিমবাবু। হাঁ। তবে সুশীলকে জব্দ আমি করবই। রিটিন এ্যাপলজি না দেয়··· আচ্ছা পরে সে ব্যবস্থা হবে। নমস্কার।

১৭

অন্ধকার পথে অন্যমনস্কে চলিতেছিলেন। এমন ভাবের উত্তেজনা হরিশের বহুদিন হয় নাই। কত ঢেউ আসিয়াছে—কত ঢেউ ভাঙ্গিয়াছে—কালের সমুদ্র উপরে ক্ষুভিত হইলেও ভিতরে স্থির প্রশান্তই ছিল। সমুদ্রের স্পিরিট কি উর্ম্মির সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়— ? আকাশের মেঘ যেমন সূর্য্যকে সর্ব্বক্ষণের জন্য আবৃত করিতে পারে না।

শুনুন।

হরিশ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। পিছনে কেহ নাই—সম্মুখেও না।

এই যে—আমি। ডানধার হইতে শব্দ আসিল।

গলার স্বর পূর্ব্বে শুনিয়াছেন—অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তিকে—চিনিতে পারিলেন না।

আমি সুশীল। আসবেন আমার সঙ্গে ? কথা আছে।

হরিশ মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, আমার কাজ আছে।

জানি—সন্ধ্যা আহ্নিক করবেন।

স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ অনুভব করিয়া হরিশ উষ্ণ হইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক তোমাদের কাছে ছেলেখেলা মনে হতে পারে—

মনে হওয়াই তো স্বাভাবিক। এতে দেশ উদ্ধার হয় না।

সুশীল! হরিশের স্বরে শাসনের সুর।

সুশীল ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সহজ স্বরে বলিল, যাই বলুন—আপনারা অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা দুর্জ্জয় সাহস ও শক্তি নিয়ে কি ক'রে যে অতীন্দ্রিয়বাদ বিশ্বাস করতেন তাই ভাবি। আপনাদের নেতারা তো হিমালয় থেকে মহাপুরুষ এনে ভারত উদ্ধার করবার স্বপ্নও দেখতেন।

সে যুগের নিষ্ঠা তোমরা ধারণায় আনতে পারবে না।

এখনও আপনাদের কোন নেতা যোগবলে পৃথিবীর চেহারা বদলে দেবার তপস্যা করছেন—তাই নিয়ে মাতামাতি করছেন—একদল লোক।

তোমরা নাস্তিক। হরিশ অগ্রসর হইলেন।

সুশীল তাঁহার পিছু পিছু চলিতে চলিতে কহিল, মানুষকে—ধর্ম্ম থেকে আলাদা ক'রে দেখাই হ'লো আমাদের নীতি।

ক্রুদ্ধ হইলেও হরিশ দাঁড়াইলেন না। ঘৃণাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, নীতি! কোন নীতির ধার তোমরা ধার! আত্মিক

শক্তি যা মানুষের সব চেয়ে বড় শক্তি তাই তোমরা অগ্রাহ্য কর। তোমরা অসংযমী।

সুশীল বলিল, তারপর এলেন অসহযোগের ঋষি। রাজনীতির সোনায় তিনিও মিশোতে আরম্ভ করলেন আত্মিক শক্তির খাদ। নখদন্তহীন চায় লাঙ্গুল নেড়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে!

হরিশ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুইচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। চাপা ভর্ৎসনাপূর্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, অসহযোগের মর্ম্ম তোমরা বুঝবে না, গোড়া থেকেই তোমরা সহযোগ ক'রে বসেছ।

হাঁ—আমাদের মটো হ'লো—ছলে বলে কৌশলে কার্য্যোদ্ধার। সততা সাধুতা এসব সমাজজীবনে প্রশংসার বিষয়—রাজনীতিতে ভূয়ো।

তুমি কি তর্ক করবার জন্যই আমার পিছু নিয়েছ?

না—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনি আমাদের ঘৃণা করেন অথচ পুলিস অফিসারের কাছে আমাদের নাম প্রকাশ করলেন না কেন?

কেন—তাও তোমায় বলতে হবে!

অবশ্য বলা-না-বলা—

না সুশীল, তোমাদের আমি একটুকুও সমর্থন করি না। তোমরা বিপ্লবের নামে অনাচার এনেছ—

বিপ্লব মানেই তো অনাচার।

না, বিপ্লব মানে সব কিছু নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া নয়। শুধু ঘৃণা—শুধু প্রতিহিংসার ভাব মনে রাখলে তাই হয়—ভালবাসা থাকলে—মানুষকে অশ্রদ্ধা করবার সাহস তোমাদের হ'তো না।

আমরা মানুষকে শ্রদ্ধা করি—অশ্রদ্ধা করি তার ভূয়ো অনুষ্ঠানকে—অস্বীকার করি ভগবানকে।

হরিশ হাসিলেন, তোমরা জল বাদ দিয়ে জলের ঢেউকে স্বীকার কর। মাটির নীচে গাছের যে শিকড় দেখা যায় না, দেখা যায় না ব'লে তোমরা মান না। তোমরা মনে কর আকাশ থেকে আলো নিয়ে গাছের পাতা সবুজ হ'য়েছে—মাটির রস ওর পক্ষে বাহুল্য!

সুশীল বলিল, উপমা আপনার ভাল আসে। সে যাক্। আমাদের পার্টিকে ধরিয়ে দেবার জন্যে আপনারা তো উঠে পড়ে লেগেছেন—

সুশীল—আমাকে তুমি এতই নীচ মনে কর?

সুশীল চুপ করিয়া রহিল।

হরিশ কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া কহিলেন, দেখ—আমার বড় ছেলের বয়সী তুমি—তোমাদের ঔদ্ধত্য দেখলে মনে ভারি কষ্ট হয়। মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখ—তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।

সুশীল বলিল, নিজের কল্যাণ আমরা চাই না—দেশের কল্যাণ হ'লেই যথেষ্ট মনে করবো।

দেশের কল্যাণ! আচ্ছা—বলতে পার—মানুষকে বাদ দিয়ে দেশ—না মানুষকে নিয়ে?

সোজা জবাব না দিয়া সুশীল বলিল, যদি বলি মানুষকে নিয়ে?

হরিশ বলিলেন, যদি নয়—ও তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

বেশ—তাতে কি?

পণ্ডিত মশাইকে অপমান ক'রে তোমার অনুতাপ হয় নি?

না। নির্ভীক কণ্ঠে সুশীল জবাব দিল। পুরাতন নীতি, সম্মানবোধ—প্রথা, অনুষ্ঠান সব কিছুকে আমরা ভাঙ্গব।

বেশ ত—গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধ দাও। দেশের ধনী লোক যাদের কম ক্ষমতা—তাদের ওপর অত্যাচার কর কেন? বেশী ক্ষমতা যাদের তাদের কাছে যেতে পার না?

আমরা যতটুকু ক্ষমতা সেই অনুসারে কাজ করি। আমরা বাস্তববাদা।

হরিশ অনুচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, সুবিধাবাদীও বলতে পার।

সুশীল তখনও তাঁহার পিছনে আসিতেছে।

তোমার সঙ্গে কথা তো আমার শেষ হ'লো, আবার আসছ যে ?

আপনি আমাদের পার্টিতে আসুন না।

আমি ?

আপনার মনে আগুন আছে—কিন্তু আপনি বিভ্রান্ত। আপনি কি স্বীকার করেন না—দেশের মধ্যে এই যে শোষণ-নীতি চলছে—ঘুষ ব্ল্যাক মার্কেট পুঁজিবাদীর লোভ—এসবের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য ?

নিশ্চয়ই স্বীকার করি। অন্যায়ের মূল কোথায় সে তোমরা দেখবে না—কতগুলো ডাল ধ'রে নাড়লে গাছের কতটুকু ক্ষতি ! ভয় দেখিয়ে অন্যায় লোভ দমন করা যায় না। এক সময়ে আপনারা তো সন্ত্রাসবাদের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ—

ওটা ছিল পরীক্ষা। ভুল। হিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না।

আপনাদের ভুল স্বীকার করেন ?

তোমাদের ভুলও স্বীকার কর—

শেষ পর্য্যন্ত না দেখে একে ভুল ব'লে মানতে পারি না। হাঁ—ভাল কথা, আজ যদি আপনার চাকরি যায়—কাল নীতিধর্ম্ম বজায় থাকবে তো ?

সে ভগবানের ইচ্ছা।

কিছু দূর আসিয়া হরিশের মনে হইল—এই বিপথগামীদের কিছু শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া নিজেদের প্রচার করিবার পন্থাটি ইহারা ভালমতেই জানে। জানে অশিক্ষিত জনগণ অভাবের তাড়নায় হিংস্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াই আছে, সম্পন্ন প্রতিবেশীর অর্থ ও সৌভাগ্য কোন দিনই দুর্গতদের প্রীতির কারণ নহে।

সেই মনে-পোষণ-করা অক্ষম হিংসাকে যতক্ষণ জীয়াইয়া রাখা যায় ততক্ষণই আন্দোলন চলে ভাল। দোকান লুঠ, ঘরে আগুন দেওয়া, প্রহার, অপমান এই সব বর্ব্বর প্রকৃতিজাত আনন্দই এইরূপ বিপ্লবের মূল উপজীব্য। এই শক্তিক্ষয়কর বিপ্লবের অবসান যত শীঘ্র ঘটে ততই ভাল। আশ্চর্য্য, যে দল দরিদ্রের নামে এইভাবে জুলুম করিয়া অর্থবানকে উৎপীড়ন করে—ধনীর রোষবহ্নি তাহাদেরই বাদ দিয়া অগণ্য নিরীহ দরিদ্রকে পুড়াইয়া মারে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ, মাথার সঙ্গে হাত-পায়ের বিরোধ, বিরোধটাই যেন সব, গোটা মানুষটাকে লইয়া কেহ ভাবিতে শিখিল না। না, দুর্নীতির দমন হওয়াই ভাল। মানুষ মাথা তুলুক—দুর্নীতি ধ্বংস হোক, নহিলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকিবে না।

১৮

বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, ফিল্মের মধ্য দিয়ে ছেলেদের যে শিক্ষা দেওয়া যায় তা নাকি চমৎকার।

কেন—মানুষ শিক্ষা দিতে পারে না?

পারে—তবে ছেলেরা সেইসব শিক্ষা নিতে পারে চট ক'রে —যাতে চোখ-কান-মন সব একসঙ্গে যোগ দেয়। প্রথমভাগে তাই ছবি দেওয়া আছে।

হরিশ ছেলের পানে চাহিয়া হাসিলেন। বলিলেন, ওরে চটকে ছেলে ভোলানো যায়—কিন্তু সে কি স্থায়ী হয়!

কেন হবে না। ছেলেরা যা একবার শেখে—তা কখনো ভোলে না।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন, তাই তো ছেলেদের যা তা শেখানো চলে না।

দুর্গা বলিল, বাবা—আমাদের একদিন টকি দেখতে নিয়ে চল না?

টকি মানে কিরে দুর্গা? হরিশ কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইস্ জানি না নাকি! কেন—যে ছবিতে কথা কয়।

হরিশের কৌতুকপ্রবৃত্তি শুকাইয়া গেল। এতটুকু মেয়ে অনেক কিছুই শিখিয়াছে। কহিলেন, না টকি দেখে না। ও ভাল নয়।

না ভাল নয়। নিজে যাবে না তাই বল। অভিমানভরে' দুর্গা চলিয়া গেল।

হরিশ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কি বলিস—টকি দেখা ভাল।

বিষ্ণু বলিল, বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের কল্যাণ করেছে। একে অস্বীকার করা যায় না—বাবা।

হরিশ তর্ক তুলিলেন, বিজ্ঞানের সব ভাল—সে কথা সবাই স্বীকার করেন না। ছেলেকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, অবশ্য বলতে পার—সুপ্রয়োগ দ্বারা ওতে ভাল বই মন্দ হয় না। হয় না স্বীকার করি। কিন্তু সুপ্রয়োগটাই যে শক্ত জিনিস।

বিষ্ণু বলিল, সিনেমার ক্ষেত্রে নাকি দেখা গেছে—

হুঁ। হরিশ আর কথা কহিলেন না। তাঁহার মুখে অপ্রসন্ন কয়েকটি রেখা দেখিয়া বিষ্ণুও চুপ করিল।

আজ রাত্রিও মেঘে ভরা, পৌষের শেষে ছুই একদিনের জন্য প্রতি বৎসরই বৃষ্টি নামে, মেঘমহলে তারই আয়োজন। জানালাটা খোলাই ছিল। সামনে সরকারদের বাগানে হাস্নুহানা ফুটিয়াছে—তার উগ্র গন্ধ জানালা দিয়া ঘরে আসিতেছে। হরিশের মনে হইল—বিড়ির গন্ধ!

ওঘরে গিরিশ নাই—অথচ গন্ধ যে কোথা হইতে আসিতেছে!

উমার মা উমার সঙ্গে কি গল্প করিতেছেন। গল্পের বিরতি-ক্ষণে উহাদের মৃত্যু হাসির ধ্বনিও শোনা যায়। বেশ নিরুদ্বিগ্ন জীবন। বাহিরের আগুনের আঁচ ভিতরে আসে না; পরিপূর্ণ একটি সংসারের মধ্যে জীবন গুটাইয়া আছে। আদর্শের সংঘাত নাই—সংঘাতের জ্বালা নাই—সংসারের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া জ্বালা উহাদের স্পর্শও করে না।

দয়াময়ী এ ঘরে আসিলেন, শুনছো—উমা বলে—আসছে সপ্তাহে ও শ্বশুর বাড়ি যাবে।

কেন—জামাই যে বললেন মাসখানেক এখন থাকবে।

মেয়ে বলে—শাশুড়ী একলা মানুষ—ওঁর কষ্ট হবে।

মেয়ের কষ্ট হচ্ছে না তো?

মেয়ের আবার কিসের কষ্ট?

এখানে—খাওয়া দাওয়ার কষ্ট। ওর শ্বশুরের তো শুনি মাছ না হ'লে খাওয়া হয় না—শাশুড়ী দু'বেলা চা খান—দোক্তাও খান। বলি মেয়েরও অভ্যাস—

যত কষ্টই হোক, কষ্ট সইবার অভ্যাস ওর আছে।

না-না, কষ্ট সইবার দরকার কি ওর। গোত্রান্তরে যে গেছে—তাকে কষ্ট দেবার কি অধিকার আমাদের। ওকে পাঠিয়ে দেও।

সেই উমা—। কনকাঞ্জলি দিবার সময় কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যে মায়ের কোলে নিজেকে সঁপিয়া দিয়াছিল ছোট্ট বালিকার মত। বাপের মুখ শুকনা দেখিয়া যার চোখ দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিত। রথের মেলায় পুতুল কেনার আর চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক দেখাইতে লইয়া যাওয়ার সময়, দোলে—পূজায় আবীর আর পোষাক লইয়া কিংবা গঙ্গায় স্নানে যাইবার আগ্রহে যাহার মান-অভিমান বায়নার অন্ত ছিল না। এই সবই হইত হরিশকে ঘিরিয়া। উমা মেনকার কন্যা, গিরিরাজ হিমালয়ের কাছে কন্যার চেয়েও অধিক। তাই কথায় কথায় দয়াময়ী বলিতেন, বাপ-সোহাগী। গিরিগাত্রচ্যুত প্রকাণ্ড এক শিলার মত—সেই উমা গড়াইয়া পড়িল ক্ষেত্রান্তরে। স্থানচ্যুতির সময় তার কি আর্ত্তি—কি কলরব! তখন মনে হইয়াছে—গিরিবক্ষ বুঝি বা বিদীর্ণ হইয়া গেল—শিলাও

পতন-আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কালের প্রলেপে —সে দুঃসহ ব্যথা আজ আর নাই। আজ যে ভূমিতে আশ্রয় পাইয়াছে শিলা—তাহারই মাটির রসে পরিপুষ্ট হইয়া তার চারিদিকে গড়িয়া তুলিয়াছে হরিৎশ্রী। শস্যশালিনী এক নূতন পৃথিবী। এই জগতের বার্ত্তা ও জগতে বিনিময় হয়—কিন্তু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠাভূমিতেই পরস্পর যেন সার্থক হইয়া আনন্দলাভ করিতেছে।

…জানালা দিয়া আকাশ দেখা যায়।

মেঘ জায়গায় জায়গায় কাটিয়া গিয়া নীল আকাশ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই নীলে তারার বিন্দু ফুটিয়াছে। পৃথিবী হইতে মনে হইতেছে কত কাছাকাছি—কিন্তু অনন্ত শূন্যে উহাদের পরস্পরের দূরত্ব হয়তো লক্ষ যোজন। এক আকাশে ফুটিয়াও ওরা ভিন্ন জগতের।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। ঠাকুর মা বলিতেন, পৃথিবীর মানুষ অনন্ত পুণ্যে স্বর্গবাস করে। আকাশের তারা হইয়া সে স্বর্গে ফুটিয়া থাকে। পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ ছেলেবেলায় ছিল বৈকি। স্বর্গবাসের কল্পনা—ভোগের কল্পনা। স্বর্গের কল্পনাও তো মর্ত্ত্যকে জড়াইয়া। অর্থাৎ মাটির প্রতিবিম্বই আকাশের রূপ। মাটিতে যা ফলে আকাশে তাই ফোটে। তবু মাটিতে আর আকাশে অনেকখানি তফাৎ।

১৯

স্কুলের ছুটির পর মাষ্টারদের পরামর্শ সভা বসিয়াছে।

হেড মাষ্টার শুষ্কমুখে বলিলেন, দু'টি সমস্যা সামনে, তার পরামর্শের জন্য আপনাদের ডেকেছি। টেষ্ট পরীক্ষার ফল আশাজনক নয়। ক্লাস টেনে বাইশ জন ছেলের মধ্যে পাঁচজন নভেম্বরে স্কুল ছেড়ে দেয়।

সেকেণ্ড মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, স্কুল ছাড়ার কারণ ?

হেড মাষ্টার বলিলেন, তাদের অভিভাবকরা বলেছিলেন ছেলেরা চাকরি পেয়ে গেছে আর পড়িয়ে লাভ নেই।

ম্যাট্রিক পাশ না ক'রে কি এমন চাকরি পেলে ?

কি জানি—কোন আমেরিকান প্লেন কারখানায় ফার্ষ্ট অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট সত্তর টাকা, প্লাস অ্যালাউন্স কুড়ি। আরও ওভার টাইম খাটলে দশ বিশ টাকা। তার মধ্যে দু'টি ছেলে ছিল ভাল—একটি তো ডিষ্ট্রীক্ট স্কলারসিপ পাবার মতো।

নিশ্বাস ফেলিয়া সেকেণ্ড মাষ্টার কহিলেন, মাষ্টারীতে কিছু নেই, পনেরো বছরে ষাটটি টাকা। কত আবেদন নিবেদন ক'রে

চারটি টাকা মাত্র ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স! আমরাও চেষ্টা করবো ওই সব ফার্মে ঢুকতে।

হেড পণ্ডিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তোমরা যুবক, তোমাদের আশা আছে, আমরা যে শেষ হ'য়ে গেলাম!

হেড মাষ্টার কহিলেন, সতেরো জন ছেলের মধ্যে ছ'জন মাত্র পাশ করেছে পরীক্ষায়। তাও ফার্ষ্ট ডিভিসনে কেউ নয়। এইট্টি পারসেন্ট পাঠাই কি সাহসে!

সেকেণ্ড মাষ্টার কহিলেন, দিন কপাল ঠুকে সব ক'টাকে পাঠিয়ে। আর তু'মাস ধ'রে সকালে স্পেশ্যাল ক্লাস বসিয়ে কিছু মেক-আপ ক'রে দেওয়া যাক।

সবারই এই মত? হরিশ বাবু কি বলেন?

হরিশ বলিলেন, বনেদ কাঁচা থাকলে ফল ভাল হয় না। তু'মাসে কতটা আর মেক্-আপ করবেন!

না পাঠালে সেক্রেটারির হুম্‌কি শুনলেন তো সেদিন?

শুনলাম, ছেলে পড়ানো আমাদের বিড়ম্বনায় দাঁড়িয়েছে।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, এর চেয়ে কোন আপিসে চাকরি করা ভাল। মনিব একজনই থাকেন।

হেড মাষ্টার বলিলেন, ছেলে না পাঠালে অভিভাবকরা রাগ করবেন। তাঁদের অনেকেই তো বলেন অত বুঝি না মশায়,

জ্ঞানকরী কি অর্থকরী বিদ্যা। কোন রকমে পাশ ক'রে একটা চাকরি পেলেই যথেষ্ট।

সেকেণ্ড মাষ্টার কহিলেন, আমরাও মাইনে বাড়াবার দরখাস্ত করি—না হ'লে চাকরি ছেড়ে দেব।

হেড পণ্ডিত বলিলেন, তোমাদের কি ভায়া—বয়স কম, বিদ্যা আছে, উৎসাহ আছে—

হেড মাষ্টার বলিলেন, দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সুশীল এ্যাপলজি চাইবে না। ওদিকে সেক্রেটারিও কলকেতা থেকে এক চিঠি দিয়েছেন—পরশুর মধ্যে জবাব চাই।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন, চাকরি গেলে ওর শাপে বর হবে।

তাহ'লে কাল কমিটির মিটিং ডেকে এগুলি ঠিক ক'রে ফেলি। কি বলেন ?

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, হরিশ হয়তো ঘাড় নাড়িয়াছেন—হয়তো নাড়েন নাই। অধিকাংশ মাষ্টার যেখানে এক মত—সেখানে হরিশের প্রতিবাদের মূল্য কি ? তাঁর কেবল মনে হইতেছে বিদ্যালয় আজ কোন্ পথে চলিতেছে ? কি আশা বুকে লইয়া স্বল্প বেতনে চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ করিয়া জীবনটাকে ক্ষয় করিয়া ফেলিলেন ? যুদ্ধের বর্ষায় এ দেশের আবহাওয়ায় জলীয় অংশ এত বেশী জমিয়াছে যে—সংস্কৃতির আগুন জ্বালিবার এতটুকু উপায় নাই।

কমিটি সুশীল মাষ্টারকে বরখাস্ত করিবার ও সব ক'টি ছেলেকে পরীক্ষায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। হরিশ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিলেন না, নিরপেক্ষ দর্শকের মত বসিয়া রহিলেন।

বাড়ি আসিতেই বিষ্ণু বলিল, বাবা—শুনেছেন, এখানে এ-আর-পিতে লোক নিচ্ছে।

হরিশ ছেলের পানে চাহিলেন।

বিষ্ণু বলিল, ভাবছিলাম, সপ্তাহে একদিন মাত্র নাইট ডিউটি, কাজটা নিলে কি হয়। মাসে দশটা টাকা পাওয়া—

হরিশ এমন তীব্র দৃষ্টিতে বিষ্ণুর পানে চাহিলেন যে, সে কথা শেষ করতে পারিল না।

বিষ্ণু চলিয়া যাইতেছিল—হরিশ কহিলেন, শোন, এবার টেষ্টের যা রেজাল্ট হ'য়েছে—তাতে একজনও ফার্ষ্ট ডিভিসনে উতরাবে না। ষ্টাণ্ডার্ড কতদূর লো হ'য়ে গেছে—সে খবর রাখ?

বিষ্ণু মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল রহিল।

যাও—পড়গে। ছাত্রের মন নানান দিকে দেওয়া আমি পছন্দ করি না—ওতে লেখা পড়ার বিঘ্ন হয়।

বিষ্ণু চলিয়া গেল।

একখানি রেকাবীতে কিছু ফল ও ছু'টি রসগোল্লা লইয়া

দয়াময়ী ঘরে ঢুকিলেন। রেকাবীখানি মেঝেতে নামাইয়া—একখানি ছেঁড়া কম্বলের আসন পাতিয়া কহিলেন, বেয়ান পাঠিয়ে দিয়েছেন। উমাকে নিয়ে যাবার জন্যে ওর মাস্-শাশুড়ী নিজে এসেছেন। একেবারে গঙ্গাস্নান ক'রে যাবেন এইজন্যে।

হরিশ কহিলেন, তুমিও দেখি বদলে গেছ! সন্ধ্যের আগে জল খাই কোন দিন!

এখনও ছু'ঘণ্টা বেলা আছে।

তা হোক—সন্ধ্যের পর দিয়ো।

রেকাবী না তুলিয়া দয়াময়ী কহিলেন, আজকাল কি ভাব দিনরাত বলতো? ছেলে পড়াতে যাবে না?

না। মনে করছি—ছেলে পড়ানো ছেড়ে দেব।

কেন?

আমি আর পারছি না। এই মন নিয়ে ছেলে পড়ানো যায় না। ভাব তো কত ছুঃস্থ বিধবা—কত দরিদ্র পিতা—তাঁহার সর্ব্বস্ব খুইয়ে আমার হাতে ছেলের ভার দিয়েছেন তাদের মানুষ ক'রে তুলতে। আর আমরা কি করছি? তারা যাতে মানুষ হয়—সে শিক্ষা দিতে পারছি কি?

সবাই যা করছে—তুমিও তাই করছ—তবে অন্যায়টা কি।

অন্যায় সবাই মিলে করলেই ন্যায় হ'য়ে যায় না।

কেন—তোমার উপরিওয়ালা যা বলবেন তাও অন্যায়?

হরিশ হাসিয়া বলিলেন, উপরিওয়ালার নীতি-বোধে বাধে নি ব'লে এত বড় দুর্ভিক্ষটা হয়ে গেল! যাঁদের টাকা আছে—ক্ষমতা আছে তাঁরাই উপরিওয়ালা নন—নীতি-নির্দ্দেশক নন। উপরিওয়ালারও ওপরে একজন আছেন।

ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দেবে নাকি?

দিলামই বা। একটি ছেলে তোমার উপার্জ্জন করছে আরও ছেলেরা উপার্জ্জন করবে—তোমার রাজত্ব ভাল ভাবেই চলবে।

আমার রাজত্বের জন্যই আমার ভাবনা, নয়? দয়াময়ী পিছন ফিরিলেন।

হরিশ বুঝিলেন—অভিমান, কিন্তু সে ভাঙ্গাইতে তাঁর প্রবৃত্তি হইল না।

২০

দশটা বাজে। মাঠ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হরিশ চলিয়াছেন ইস্কুলে। পাশের বাড়ির ঘড়িটা ক'দিন হইতে অত্যন্ত শ্লো হইয়াছে। তাহার ধ্বনি শুনিয়া ইস্কুলের হাজিরাটা নিয়মিত দিতে পারেন নাই। সূর্য্য দেখিয়া সময় নির্ণয়ে হরিশের ভুল হয় না, কিন্তু ক'দিন হইতে সূর্য্যও মেঘের আড়ালে রহিয়াছেন। তা ছাড়া মনের মধ্যেও চিন্তার ধারা বড় এলোমেলো। ক'দিন হইতেই মনে হইতেছে শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। পৃথিবীর মাটিতে পা দিবার চেষ্টা করিয়াও পা দিতে পারেন নাই। সময়ের স্রোত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে—উত্তরঙ্গ সমুদ্রের মত। তাঁহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া চলিতেছে কত ঘটনা, কত দৃশ্য। আশা-উত্তেজনা-আনন্দ-আশ্বাসভরা মুহূর্ত্ত। পশ্চিম মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে সব—ঘটনা—বস্তু—নিয়ম এবং মানুষ। গান্ধী চেচাঁইতেছেন তারস্বরে—শ্রীঅরবিন্দ বসিয়াছেন ধ্যানে—আরও কত অনামী মহাত্মা কোন্ নির্জ্জন অরণ্যে বা পর্ব্বতগুহায় ভারতের সাধনবাণী প্রচার উদ্দেশে আরম্ভ করিয়াছেন সু-কঠিন

তপ। কিন্তু স্রোতের বেগ বড় বেশী, একটানা পশ্চিম মুখে দ্রুত ছুটিয়াছে স্রোত।

হরিশ পা চালাইয়া দিলেন।

সম্মুখে বাধা। দুইজন হাস্যমুখী তরুণী হাত তুলিয়া তাঁহার পথ আটকাইয়াছেন।

ফিরুন—ইস্কুল যাবেন না।

আপনাদের আমি তো চিনি না।

চিনবেন না। আমরা সহর থেকে এসেছি ষ্ট্রাইক চালাবার জন্য।

ষ্ট্রাইক! কিসের ষ্ট্রাইক?

আপনাদের ইস্কুলে ধর্ম্মঘট হয়েছে—যাবেন না।

ইস্কুলের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি?

মিছিমিছি কেন অপমানিত হবেন—ফিরুন।

হরিশ রূঢ়কণ্ঠে কহিলেন, পঁচিশ বছরের ওপর আমি মাষ্টারী করছি এই ইস্কুলে—আপনারা এর কতটুকু জানেন?

তরুণীরা পথ ছাড়িয়া অল্প একটু হাসিল।

ময়রার দোকানের কাছে মাধব তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়েকে লইয়া কি কিনিতেছিলেন। মাধবের গায়ে ইস্কুলের কামিজ ও কাঁধে সাদা চাদর। ইস্কুলের দেরি হইতেছে—অথচ মাধবের ভ্রূক্ষেপ নাই। ময়রার সঙ্গে বচসা জুড়িয়া দিয়াছেন।

মাধবকে ডাকিবার উদ্দেশে কাছে আসিতেই হরিশের কানে গেল ময়রার কথা, তা আমি কি করবো ঠাকুর। আমাদের ওজন আর ওনাদের ওজন যদি সমান না হয়—দোষ আমার। কণ্ট্রোলের ধারাই ওই—সেরেক্কে আধ পোয়া কম।

মাধব তর্ক করিতেছেন, আমি ভাল ক'রে দেখে নিলাম। চেনা দোকানী—চিনিও ভিজে নয়—

মাধবের বড় ছেলে বলিল, বাবা, ফোর্থ মাষ্টার মশায়—

মাধব পিছন ফিরিয়াই পাংশু হইয়া গেলেন। কি অসহায় করুণ চোখে হরিশ তাঁহার পানে চাহিয়া আছেন।

ময়রা বলিল, পাঁচ সিকের হিসেবে—দাম আপনার এক টাকা ছ'পয়সা। ধরুন।

মাধব হাত পাতিলেন না, ছোট মেয়েটি পয়সাগুলি তুলিয়া আঁচলে বাঁধিল।

বড় ছেলে বলিল, বাবা—ইস্কুল যে বন্ধ—ওদিকে যাচ্ছ কোথায়?

হরিশ নিমেষ মাত্র দাঁড়াইয়া পুনরায় দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মাধবও ছুটিতেছেন তাঁহার পিছু পিছু। একটা কিছু কৈফিয়ৎ তাঁহাকে দিতেই হইবে।

ইস্কুলের প্রবেশ পথ একটিই; দূর হইতে দেখা গেল—বহু লোক সেখানে জমা হইয়াছে। লোক অনেক জমিয়াছে বটে—

কোলাহল তেমন নাই। হাটের মত বা মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌-শনের মত হৈচৈ হট্টগোল—টানাটানি—গালিগালাজ এ সব কিছু নাই—শুধু নিঃশব্দে তাহারা চলাফেরা করিতেছে।

ইস্কুলের লোহার ফটকটা খোলা। খোলা ফটকের সামনে কয়েকটি কিশোর বয়স্ক ছেলে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাদের দুধারে দু'জন তরুণী। নূতন কোন মাষ্টার আসিলেই ছেলেরা—চীৎকার করিয়া শ্লোগান আওড়াইতেছে।

হরিশ মাষ্টার গেটের সম্মুখে আসিতেই ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দেমাতরম্‌।

হরিশ মাষ্টারের বুকে—বহুবৎসর আগেকার বিস্মৃত একটি ঢেউয়ের দোলা আসিয়া লাগিল। ও ছেলেরা যে মাতাকে বন্দনা করিতেছে—সেই বন্দনীয় মাতাকে তিনিও এককালে চিনিতেন। দুই হাত তুলিয়া—তিনি তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে যাইবেন—পাশ হইতে হেড মাষ্টার কহিলেন, সরে আসুন।

হরিশ তাঁহার পানে চাহিয়া কহিলেন, আপনি ভাববেন না কিছু। ওরা খেলার মত ক'রে জিনিসটি দেখছে।

না—মোটেই তা নয়। অর্গ্যানাইজার আছে পিছনে। পার্টি মোটেই হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

হরিশ বলিলেন, কি করবেন—ইস্কুল বন্ধ রাখবেন ওদের এই ছেলেমানুষিতে?

উপায় কি ? সেক্রেটারিকে টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম।

তারপর ?

তিনি এসে যা হয় ব্যবস্থা করুন। দায়িত্ব আমরা ঘাড়ে নেব কেন ?

সেকেণ্ড মাষ্টার ওপাশ হইতে বলিলেন, তিনি হয়তো জেলা থেকে আর্ম্মড পুলিশ নিয়ে আসবেন।

হরিশ শিহরিয়া উঠিলেন। না না, তা হ'তে দেওয়া উচিত নয়। আমরা মাষ্টার—ছাত্র কণ্ট্রোল করতে হয় আমরা করবো—সেক্রেটারিকে হাত দিতে দেব কেন ? পুলিশ ডাকব কেন ?

হেড মাষ্টার হাসিলেন, ঘটনা কণ্ট্রোল করা শক্ত।

আপনি বুঝিয়েছিলেন।

নিশ্চয়ই। আপনিও ইচ্ছে হ'লে বোঝাতে পারেন।

হাঁ—আমি বোঝাবো। পঁচিশ বছরের ওপরে এ ইস্কুলে আছি—আমাকে ওরা চেনে—ওদের বাবা দাদারাও চেনে। পরম আশ্বস্ত মনে হরিশ পা বাড়াইলেন।

মাধব পিছন হইতে তাঁহার জামার হাতা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, শোন—

মুখ ফিরাইয়া হরিশ তীব্রদৃষ্টিতে মাধবের পানে চাহিলেন—মাধব সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গেলেন।

২১

হরিশ আসিয়া গেটের সম্মুখে দাঁড়াইতেই—ছেলেরা 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

হরিশও হাত তুলিয়া হাসিমুখে উচ্চারণ করিলেন, বন্দে মাতরম্।

ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল ছেলেদের কণ্ঠে। তাহারা ভাবিল হরিশ মাষ্টার তাহাদের পক্ষে যোগ দিলেন। তাহারা পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিল।

হরিশ হাত তুলিয়া কহিল, শোন।

ছেলেরা চুপ করিল।

হরিশ বলিলেন, এত অল্প বয়সে তোমাদের দেশ-প্রীতি সত্যই আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভারি খুসি হয়েছি। শোন। যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের জন্মভূমিকে চেনা না যায়—সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। আবার জীবনে শিক্ষার আলো যার না জ্বলে—তার জীবনও বৃথা। ছেলেবেলার হুজুগে মন মাতে ব'লে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা উচিত।

তোমরা কোন আন্দোলনের মধ্যে যাবে না—যতদিন না শিক্ষা সমাপ্ত হয়—

তরুণী দুইটি বুঝিল হাওয়া কোন্ পথে বহিতেছে। একজন অগ্রসর হইয়া কহিল,—হুজুগের মধ্যে ছেলেরা যাবে না—এ খুব সত্য কথা, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে শিখলে—ওরা সাহসী হবে কেন? জানেন তো—

অন্যায় যে করে—আর অন্যায় যে সহে—
তব রোষ তারে যেন তৃণসম দহে।

হরিশের প্রশান্ত ভাব চলিয়া গেল। স্বরে জোর দিয়া কহিলেন, আপনারা ইস্কুলের কেউ নন—আশা করি—মাষ্টার ছাত্রের মাঝখানে কোন কথা কইবেন না।

অনধিকার চর্চ্চা আমরা করি না তবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো। আপনি মাষ্টার হয়ে কি ব'লে আর একজন মাষ্টারের অপমান সহ্য করেন? তাঁর অপমান আপনার অপমান নয়?

হরিশ অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিলেন, তর্ক আপনার সঙ্গে করবো না। আমার ছাত্রদের সামনে থেকে শুধু সরে দাঁড়ান।

দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু সে অপমানের প্রতিকার না-হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা ইস্কুলে ঢুকতে পাবেন না।

তরুণী সরিয়া পাশে দাঁড়াইলে—ছেলেরা সজোরে মাতাকে বন্দনা জানাইল।

হরিশ—অসহ্য রোষে ফুলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা হইল ওই জ্যেঠা মেয়েটির কান ধরিয়া সজোরে দু'টি চড় বসাইয়া দিয়া—ওর কথার প্রত্যুত্তর দেন। অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া ছেলেদের সামনে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, দেখ বাবা—বদ্‌লোকের পরামর্শে ভুলে অসৎ কাজ করো না। তোমাদের মাষ্টারেরা যা ভাল বুঝেছেন—করেছেন। তোমাদের কি উচিত লেখাপড়া ছেড়ে দুষ্টুমি করা ?

উচিত—উচিত। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। সমস্বরে ধ্বনি উঠিল।

হরিশ তথাপি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না—মিষ্ট করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, ন্যায় অন্যায় তোমরা কতটুকু বোঝ ? তোমাদের অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—এ অন্যায়। গুরুজনের কথা না শোনা পাপ।

পাপ নয়। আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি। সমকণ্ঠে ছেলেরা চীৎকার তুলিল।

পথ ছাড়। বজ্রকণ্ঠে হরিশ হাঁকিলেন। অন্যায় কি তোমরা জান না—জানবার বয়স তোমাদের হয়নি। যাও ভাল ছেলের মত বইখাতা নিয়ে ইস্কুলের বেঞ্চিতে গিয়ে বোস গে।

হরিশের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। মৃদুকণ্ঠে একটি ধমক দিলে ক্লাস নিস্তব্ধ হইয়া যায়। দুষ্টছেলেরাও মুখ তুলিয়া কথা

বলিতে সাহস করে না। বেত আজকাল ব্যবহার করিবার প্রথা নাই—তবু বেতের চেয়ে অমোঘ শক্তি তাঁর ধমকের।

ছেলেরা ভয়ে একপাশে সরিয়া গেল, মুখ তুলিয়া হরিশ মাষ্টারের পানে চাহিতে পারিল না—কিংবা মাতার বন্দনা ধ্বনিও কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না।

ছোট্ট একটু প্রবেশ পথ—একজন লোক ভিতরে যাইতে পারে—হরিশের সম্মুখে প্রসারিত। পিছন ফিরিয়া হরিশ মাষ্টারদের ডাকিলেন, আসুন।

একটি বারো বছরের ছেলে—ছুটিয়া পথ রোধ করিল, কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া হাঁকিল:

বন্দে মাতরম্।

ভীত ছেলেরা নববলে বলীয়ান হইয়া তাহার চারিপাশে জড়ো হইয়া সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিল। খেলা তাহাদের জমিয়াছে ভাল।

হরিশ আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল দুষ্টবুদ্ধি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়াই শিক্ষকদের অপমান করিতেছে। শুধু শিক্ষকদের অপমান নহে, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের অপমান, জন্মভূমির অপমান। নির্ব্বোধেরা জানে না—ওই বীজমন্ত্রের পরিহাসময় উচ্চারণ জাতির পক্ষে কতখানি অনিষ্টকর। 'বন্দেমাতরম্' শ্লোগান নহে, ও প্রাণের জিনিস।

বজ্রকণ্ঠে হরিশ হাঁকিলেন, চুপ চুপ।

লম্বামত ছেলেটি হাঁকিল, শেম্ শেম্।

কাঁপিতে কাঁপিতে বাঘের মত লাফ দিয়া হরিশ ছেলেটির ঘাড়ে পড়িলেন। তারপর মাষ্টারেরা আগাইয়া আসিলেন, ছেলেরাও ছুটিয়া আসিল। ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উঠিতে লাগিল। পথের লোকও ছুটিয়া আসিয়া কোলাহল বাড়াইয়া তুলিল। কয়েকটি ছেলে [illegible] সামনে [illegible] শুইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল।

[illegible]রা হরিশকে অতি কষ্টে ব্যূহের বাহিরে আনিলেন।

[illegible] অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর। মাথার চুলগুলি বিশৃঙ্খল, চোখ দুটি লাল, দৃষ্টিতে সম্বিৎ নাই। গায়ের জামাটা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—শুধু বাম হাতের উপরে ঝুলিতেছে হাতাটা। বুকে পিঠে আঁচড়ের দাগ—রক্তের রেখা দেখা যায়।

মাধব তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, চল।

বিনা আপত্তিতে হরিশ মাধবের অনুবর্ত্তী হইলেন।

পথ যেখানে মোড় ফিরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়াছে সেখানে পৌঁছিয়া হরিশ একবার পিছন পানে চাহিলেন। ইস্কুলের খানিকটা দেখা যায়, জনতা গা নাড়া দিতেছে এবং অস্পষ্ট কোলাহলও কানে আসিতেছে। তবে সে ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্' কিনা বোঝা যায় না।

হরিশ মাধবকে অনুসরণ করিলেন।

পথের ধারে মাঠ। মাঠের [illegible] আট-দশ [illegible] গেলে প্রকাণ্ড একটি অশ্বত্থ গাছ পড়ে। তার ছায়ায় [illegible] [illegible]শকে আনিয়া বসাইলেন। [illegible]

কাল রাত্রিতে আকাশে মেঘ জমিয়াছিল, এখন আকাশ পরিষ্কার। তবে বাতাসটা এখনও পূর্ব্ব হইতে বহিতেছে। পূর্ব্বমুখী বাতাস নূতন মেঘ জমাইয়া দুই এক পশলা বৃষ্টিও আনিতে পারে। দিগন্তের আশেপাশে টুক্‌রা-টাক্‌রা ছেঁড়া মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মাধব বলিলেন, বাড়ি যাবে না?

হরিশ মাথা নাড়িয়া চক্ষু বুজিলেন।

জল আসতে পারে।

হরিশ কথা কহিলেন না।

তোমার গায়ে জামা নেই—পোষের এই বাদলা—

হরিশ এ জগতে নাই।

বহুক্ষণ নানা প্রকারে প্রশ্ন করিয়াও মাধব হরিশকে—হাঁ—কিংবা না বলাইতে পারিলেন না। লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? অবশেষে মাধব বিরক্ত হইলেন—শীত শীত বোধ হইতে লাগিল। সূর্য্য গাছের আড়ালে পশ্চিম দিকে হেলিয়াছেন—দিগন্তের মেঘগুলা বাতাসে ভর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাত্রির আসন্ন দুর্য্যোগ ইতি-মধ্যেই [illegible] হইতে[illegible]

[illegible]টা নির্জ্জন ছিল, এইবার লোকসমাগম আরম্ভ হই[illegible]পাঁচটা কুড়ির ট্রেণ আসিয়া গেল। একটু পরেই আপিস-প্রত্যাগত বহু মানুষের পায়ের শব্দ ও কলরব পথ ধরিয়া মাঠের বুকে ছড়াইয়া পড়িল। বিড়ির প্রবল গন্ধ পূর্ব্ব-মুখী বায়ুতে ভর করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে শায়িত হরিশের নাসারন্ধ্রে জ্বালা ধরাইয়া দিল। সেই সঙ্গে কতকগুলি অশ্লীল আলাপ ও ইতর রসিকতাও। এই চাটুজ্জ্যে—আজ আপিসে বড়বাবুকে আচ্ছা তুড়ুম ঠুকে দিয়েছি। এসেছিল ফুটুনি করতে আমাদের কাছে! বলে, সায়েব বলেছে—যারা যারা কাজ ফাঁকি দিচ্ছে—তাদের নামে দাও চার্জ্জশীট্।

কি বললি?

বললাম, আমরা তো তেল মালিশ ক'রে ক'রে বড়বাবু হইনি—

বেশ বলেছিস। শা—র ভারি রোয়াবি। তেল মালিশের চূড়ান্ত রে ভাই—বাড়ীর বউকে পর্য্যন্ত নাকি—

মাইরি—মাইরি?

ছুত্তোরি আপিস আর বড়বাবু! ছুটির পর কোথায় দু'টো কাঁচা পাকা মুখ দেখব, দু'একখানা প্রাণ-তর্-করা গান শুনব, খানিক বা আমোদ-ফুর্ত্তি করব—না থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়! গম্ভীর গলায় [illegible] দিয়া উঠিল।

ঠিক বলেছ—কান্তদা, চল আজ সিনেমা [illegible] যাক। নিউ থিয়েটার্সের দিদি দেখেছ? লীলা দেশাই যা [illegible]— যেন···

একজন সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, মার কাটারি।

সম্মিলিত হাসির ঢেউয়ে মাঠ ভাসিয়া গেল। হরিশের আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাধব পাশে নাই—কখন চলিয়া গিয়াছেন।

পথ দিয়া দলে দলে যারা চলিয়াছে—তাদের অনেককেই হরিশ চেনেন। কেহ সবে ইস্কুল ছাড়িয়াছে—কেহ গত বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। তরুণ—তাজা ছেলেগুলি—চোখে সবকিছু জানিবার আগ্রহ, মনে অপরিমিত কৌতূহল। জগতের জগতের রূপ রহস্য ও আদি অন্ত জানিবার কৌতূহলে পরিপূর্ণ। বাতাসের দাক্ষিণ্যে উন্মোচিত ফুলের পাপড়ীগুলি বাল-সূর্য্যের

লাল আলোতে মাখামাখি। বিশ্বস্রষ্টার গৌরব বহন করিয়া হরিশ একদা উহাদের পূর্ণ-উন্মেষের জন্য কি আনন্দময় শ্রমই না করিয়াছেন!

দলে দলে আসিতেছে সেই সব ছেলেরা। কোথা হইতে? শিক্ষার স্বাদে বিহ্বল নয়—জ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত নয়—মনীষার মেধার তপস্যার স্থিতম[illegible]ও জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার কোন [illegible] ভাসিতেছে শৈবাল—বাতাসে ভা[illegible]কাশে যেমন ভাসিতেছে মেঘ। একটা যু[illegible]হইয়া গেল! ভারতবর্ষের সংস্কৃতিময় যুগের অবসান।

বিড়ির গন্ধ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। কানে গেল—গানের দুই এক কলি:

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা—

হরিশ—কষাঘাতজর্জ্জর হরিশ—পূর্ণসম্বিত ফিরিয়া পাইলেন। পূবের বাতাস হাড়ের মধ্যে ঢুকিতেছে। কি কন্‌কনে আর তীক্ষ্ণমুখী তীরের আঘাত-জ্বালা। প্রতিকূল বায়ু ঠেলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

গভীর রাত্রি। মত্ত দানবের মত গোঁ গোঁ শব্দে বায়ু দাপাদাপি করিতেছে। বৃষ্টির পিট্ পিট্ শব্দও শোনা যায়। হরিশের জীর্ণ দরজা জানালাগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে আর্ত্তনাদ

করিতেছে। ছাদ সমেত গৃহভিত্তি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতিও বুঝি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

অন্ধকার ঘর; প্রাণীগুলি নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন। হরিশের অতন্দ্র চোখে ও বিক্ষুব্ধ মনে বারংবার প্রশ্ন জাগিতেছে, এই কি শেষ?

অন্তরের মধ্যে আশাবাদী এক পরম পুরুষ বারংবার আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন—

Every cloud has a silver lining.

হরিশ স্থির থাকিতে পারিলেন না—জীর্ণ জানালার কবাটটি খুলিয়া বাহিরের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের পানে চাহিলেন। আকাশ কোথায়? দিক্ কোথায়? বিরাট মসীলেপে সব মুছিয়া গিয়াছে। বিদ্যুতের রেখা যদি আলোক-তরবারির দ্বারা এই নিকষকালো মেঘের আস্তরণ মুহূর্তের জন্যও দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিত!

জানালা বন্ধ করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চক্‌মকি, লোহা ও শোলার টুকরা সংগ্রহ করিয়া আলো জ্বালিলেন। প্রদীপে এতটুকু তেল ছিল—আলো জ্বলিল। জানালার ফাটা দিয়া দমকা বাতাস রহিয়া রহিয়া মন্দীভূত বেগে ঘরে আসিতেছে। ডান হাত আড়াল দিয়া বাম হাতে প্রদীপটি তিনি তুলিয়া লইলেন।

নিরুদ্বিগ্ন নিদ্রামগ্ন প্রাণীগুলি। দয়াময়ীর বাঁ পাশে হুর্গা ঘুমাইতেছে, ডানধারে বিষ্ণু ও শিবু। প্রদীপের কম্পিত শিখায় মনে হইল, কি করুণ অসহায় নিদ্রাতুর মুখগুলি! দয়াময়ী না হয় জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন—এই উন্মেষ-উন্মুখ কলি-গুলিতে জীবনের উত্তাপ কই? অতি রূঢ় বাস্তব—রূপরস আনন্দ ও শক্তির স্বপ্নলোক হইতে ইহাদের টানিয়া নামাইয়াছে। অনার্য্য-[illegible] পর্ব্বের অভিমুখে ছুটিয়াছে ভারত[illegible]

[illegible] আনিয়া নিজের শয্যাপার্শ্বে রাখিলেন। সেখানে ছোট ছেলে দেবু ঘুমাইতেছে। ঘুমের ঘোরে গায়ের আবরণ তার বিস্রস্ত—অনাবৃত গৌরকান্তি দেহ—শরীরের কোন অংশ একটুও সঙ্কুচিত হয় নাই।

মুখে অকুটিল—শুভ্র জ্যোতি, একটু হাসি—স্বপ্ন-ছোঁয়া-লাগা হাসি পাতলা ঠোঁট হুখানিতে লাগিয়া আছে। অল্প অল্প কাঁপিতেছে ঠোঁট।

বাহিরের দমকা বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া গেল।

হরিশ দেবুর পাশে শুইয়া পড়িলেন। আর প্রদীপ জ্বালিবার কথা তাঁর মনেই হইল না।